কল্লোল

ভাগ – I

শ্রেণি – VI

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কপোরেশন লিমিটেড

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

সম্পাদকের ভূমিকা

কল্লোল ভাগ - 1 প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার দ্বিতীয় পাঠ্য - পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে। এটি শুধু সাহিত্য পুস্তক নয় ।

কিংশুক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তরে হ'ল 'শোনা', তারপর 'বলা', 'পড়া ও লেখা'। শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে ও মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে। এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে । শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা। ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে। পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয়া শান্তিপুর ও কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে- সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয়।

সম্পাদক মন্ডলী

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে বিহার রাজ্যের মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির (I - X) জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটি বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানউপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতেই নিরূপিত হবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী যাতে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য উপযুক্ত স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপনির্দেশক
  তিরহুত প্রমণ্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** — শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** — শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** — নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পাণ্ডেয়** — কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা
ড০ বীথিকা সরকার — শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (সংকলক)
ড০ সাধনা রায় — অধ্যাপক কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ড০ বর্ণালী বসাক — অধ্যাপক গর্দানীবাগ রাজকীয় মহিলা মহাবিদ্যালয় পাটনা
কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য — সহশিক্ষক, মারওয়াড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা সিটি
ড০ শুভ্রা চৌধুরী — সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
গৌরদাস বর্মণ, প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ
শঙ্কর কুমার সরকার, সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝারিয়া কলোনী, বেতিয়া,
শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
অনিতা মল্লিক — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
ড০ শামা পরভীন — সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্যবিদ্যালয় পালি, বিহিটা,

সমীক্ষক :

ডঃ গুরুচরণ সামন্ত — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ রাত্রি রায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2006 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরণের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয়-জীবন ও তার বাইরের জীবন-চর্চার মধ্যে ফারাক থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃষ্টিমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেল ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস

নির্দেশক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,

পাটনা, বিহার

সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হোল । বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে । বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদী ধারণা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য । বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয় । এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । যে ভাবধারা মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে । সাধু ও চলিত ভাষার রচিত উভয় প্রকার লেখা সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে । আশা করা যায় শিক্ষকরা পড়াবার সময় সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন ।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে । মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠবোধ' ।

একটি পাঠ পড়ার পর শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করল বা পরবর্তী জীবনে সেই পাঠ তার সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গড়তে কতটা সহায়ক হবে, সেই দৃষ্টি কোণ থেকেই কোনো কোনো পাঠের শেষে **'আলোচনা করো' ও 'করতে পারো' এই দুইটি বিভাগ সংযোজিত হোল যা সম্পূর্ণরূপ লিখিত পরীক্ষা বহির্ভূত থাকবে ।**

'আলোচনা করো' বিভাগটিও ক্লাসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়ক হবে ।

'করতে পারো' বিভাগটিও অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের সমাজ বা পরিবেশ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কাজে প্রেরিত করবে । বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ

বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল যেমন — **রু - রু, রূ - রূ, শু - শু, ন্তু - ন্তু, ক্ত - ক্ত,**

বাড়ী - বাড়ি, পাখী - পাখি, শ্রেণী - শ্রেণি, কাহিনী - কাহিনি ইত্যাদি।

জেনে রাখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ 'পাঠ পরিচয়' ও 'পাঠবোধ' - এ দেওয়া হোলো। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে। 'কী' এবং 'কি' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তে হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি যাবে কি ? উত্তর - 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর — চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের বানানে সর্বত্র একরূপতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কল্লোল' রাখা হয়েছে। কল্লোলের আভিধানিক অর্থ শব্দকারী তরঙ্গ, মহানন্দ, কলরব। এই শ্রেণির কিশোর কিশোরীর আনন্দোচ্ছ্বাস কলরব যেন বিরামহীন তরঙ্গের মতো কূল ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই কথা মনে রেখেই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা - নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বীথিকা সরকার

কোথায় কি আছে

শ্রেণি — VI

(গদ্য)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
1.	প্রকৃত শিক্ষা বুদ্ধ জাতক কথা		1 - 10
2.	সাধুজীর স্টীমার খাওয়া	অধ্যাপক	11 - 18
3.	সুভাষের- স্মৃতি	বাসন্তী দেবী	19 - 23
4.	অপুর অলীক ভীতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	24 - 31
5.	দাদুর উত্তর	বনফুল	32 - 38
6.	গগনে উদিল রবি	অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)	39 - 46
7.	প্রাকৃতিক ভারসাম্য	অমরেন্দ্র নাথ গুহ	47 - 52
8.	বনমালীর চিকিৎসা	শিবরাম চক্রবর্তী	53 - 60
9.	চির তুষারের দেশ	সুদীপ্তা সেনগুপ্ত	61 - 64
10.	ব্যদ্যিনাথের বড়ি	লীলা মজুমদার	65 - 71
11.	বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী	মহাশ্বেতা দেবী	72 - 76
12.	বিজ্ঞান মনস্কতা	ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু	77 - 81

কোথায় কি আছে

(পদ্য)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
1.	দাঁড় ও পাল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	83 - 87
2.	দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র	কাশীরাম দাশ	88 - 91
3.	বঙ্গভাষা	অতুল প্রসাদ সেন	92 - 97
4.	রামসুক তেওয়ারী	কুমুদ রঞ্জন মল্লিক	98 - 102
5.	অধম ও উত্তম	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	103 - 106
6.	সবার আমি ছাত্র	সুনির্মল বসু	107 - 112
7.	রাখাল ছেলে	জসীমুদ্দীন	113 - 117
8.	গাছ কেটো না	নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	118 - 122
9.	রাজা - সাজা	সাধনা মুখোপাধ্যায়	123 - 127
10.	কোন পাখিটা	আশিস স্যান্যাল	128 - 131

গদ্যাংশ

প্রকৃত শিক্ষা

'বুদ্ধ জাতক কথা'

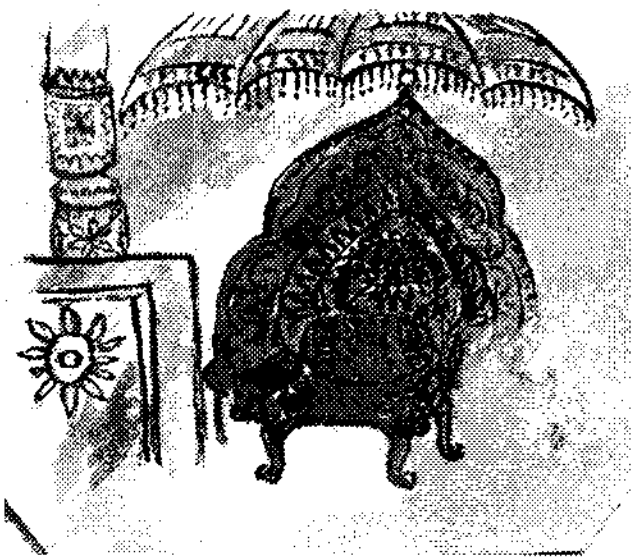

ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন বারাণসীতে । রাজার একমাত্র ছেলে, ছেলের নাম কুমার। কুমারের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য রাজার বড় ভাবনা হ'ল— কুমারকে অল্প বয়স থাকতেই যোগ্য শিক্ষা দেওয়া দরকার । মাটি কাঁচা থাকতেই তো কুমারেরা তাকে যেমন খুশি সাজে ঢালে; কিন্তু মাটি শক্ত হলে তাকে যেমন খুশি সাজে ঢালা যায় না -- ঢালতে গেলে ভেঙে যায় । তেমনি রাজকুমারকেও এখন শিখিয়ে তৈরি না করতে পারলে আর মানুষ হবে না !

রাজা কথাটি ঠিকই বুঝলেন । কিন্তু কোথায় কার কাছে শুরু শিক্ষা দীক্ষা । মন্ত্রীরা বললেন— "রাজা মশাই, আপনার রাজসভায় রয়েছে কত বড় বড় পণ্ডিত, তাঁদের হাতেই ছেড়ে দিন ছেলের শিক্ষার ভার ।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ব্রহ্মদত্ত কোথাকার রাজা ছিলেন ?
2. ব্রহ্মদত্তের ছেলের নাম কী ?
3. রাজা কুমারকে শিক্ষালাভের জন্য কোথায় পাঠাতে চাইলেন ?

কিন্তু রাজা বললেন,—"না, তা হবে না । শুধু যোগ্য শিক্ষা হলেও শিক্ষা হয় না, যোগ্য স্থানও চাই। এখানে এই রাজপুরীতে কেবল সুখ-ভোগের আয়োজন। কেবল হৈ-হৈ,

রৈ-রৈ, । শিখতে হলে যেমন নিরালা স্থান চাই, তেমনি চাই কষ্ট করা ও অহংকার অভিমান ত্যাগ করা । আর যোগ্য গুরু—সে তো চাইই ।"

মন্ত্রীরা বললেন—"তা হলে এ রকম জায়গা কোথায়।"

রাজা বললেন—"কুমারকে পাঠাব আমি তক্ষশিলায়। সেখানকার আচার্যর কাছ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করবে কুমার।"

রাণী শুনে বলে উঠলেন,—"কিন্তু এই দুধের ছেলে কি অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে, মহারাজ?"

রাজা বললেন—"এতে আর কিন্তু নেই, যাতে সহ্য করতে শেখে তাই তো দূর দেশে পাঠাচ্ছি—গুরু-গৃহে । এখানে এই রাজপুরীতে লেখাপড়া হবে না কিছুতেই ! এখানে ছেলের অহংকারের ঘোর কাটবে না—সব সময়ই ভাববে আমি তো রাজপুত্র ! অন্যায় করলেও শাস্তি পেতে চাইবে না ।"

সত্যি সত্যি, রাজামশাই একদিন রাজকুমারকে গুরুগৃহে পাঠাবার আয়োজন করলেন । কুমারের তখন কিশোর বয়স— রাজা কুমারের জন্যে হাতী-ঘোড়া, মণি-মাণিক্য দিলেন না— এমন কি কুমারকে দামী কোনো পোষাকও দিতে দিলেন না । কুমার পরল একজোড়া চটি জুতো, বগলে নিলে একটা পাতার ছাতা । তারপর বাবা মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলল সে গুরুগৃহে — সুদুর তক্ষশিলায় । রাজা ছেলের হাতে তুলে দিলেন দক্ষিণা বাবদ টাকার একটি থলে ।

পায়ে হেঁটে হেঁটে কত গাঁ ঘুরে ঘুরে একদিন কুমার এসে পৌছল তক্ষশিলায়—গুরুদেবের বাড়িতে। গুরুদেব তখন তাঁর ছাত্রদের একটা পড়া দিয়ে পায়চারি করছিলেন—বিদ্যালয়ের সামনে। কুমার দূর থেকে দেখল গুরুদেবকে কিন্তু সোজা এগিয়ে এল না; ছাতা - জুতো ছেড়ে রেখে দূরেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গুরুগৃহে যাওয়ার সময় রাজা কুমারের হাতে কী তুলে দিলেন ?
2. গুরুগৃহে কত রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ?

গুরুদেব দেখলেন বাড়ির সীমানায় করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ছেলে । গুরুদেব ছেলেটিকে কাছে ডেকে এনে দেখলেন— ছেলেটি বড় ক্লান্ত হয়েছে, সারা গায়ে ঘাম ঝরছে ঝরঝর করে। তাই তখন আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, তাড়াতাড়ি স্নান আহারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছু পরেই কুমার আবার আচার্যের পায়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল । আচার্য এবার জিজ্ঞেস করলেন--"কোথা থেকে এসেছ তুমি?"

কুমার সবিনয়ে উত্তর দিল–"বারাণসী থেকে ।"

"তুমি কার ছেলে !"

"বারাণসীর রাজার ছেলে ।"

"কি জন্যে এসেছ এখানে ?"

কুমার গুরুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল– "আপনার কাছে বিদ্যা শিক্ষা করার জন্যে ।"

গুরুদেব আবার বললেন–"দেখো বাছা, এখানে দুই রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে । গুরুগৃহের যারা কাজকর্ম করে তাদের দক্ষিণা দিতে হয় না, আর যারা দক্ষিণা দেয় তাদের গুরুগৃহের কাজকর্ম করতে হয় না । তুমি কিভাবে শিক্ষা করবে ?"

কুমার বলল–"দক্ষিণা দেবার কথাই বাবা আমাকে বলে দিয়েছেন, আর আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই দক্ষিণা ।"— এই বলে কুমার গুরুর পায়ের কাছে রাখল গুরু-দক্ষিণা বাবদ একটি টাকার থলে ।

গুরুগৃহে শান্তি

এরপর থেকে আচার্য কুমারের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন, কুমারও বেশ যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করতে লাগল নানা বিদ্যা ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গুরুগৃহে কুমারের কষ্টের কারণ কী ছিল ?
2. কুমার বুড়ির কোন জিনিস তুলে খেয়ে ফেলেছিল ?

কিন্তু কুমারের মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হত,– গুরুগৃহের খাওয়া-দাওয়ায় তার পেটের একটা দিক যেন সব সময় খালি খালি লাগত । ক্ষুধার তাড়নায় মনে মনে খাদ্যের প্রতি লোভ জন্মাতে লাগল । মাঝে মাঝে কুমার ভাবত,–এখানকার লেখাপড়া শেষ হলেই হয়, তখন তো আর এমনটা থাকব না ।

একদিন আচার্যদেব কুমার ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে স্নানে যাচ্ছিলেন নদীতে । গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কুমার দেখল,–এক বুড়ি খোসা ছাড়িয়ে তিলের শাঁসগুলি ছড়িয়ে রেখেছে রোদে, আর বেশ টাট্‌কা গন্ধ উঠছে তা থেকে ।

কুমার তখনি করল কি-না, বুড়ির এক পাশ থেকে 'টুক্' করে একমুঠো তিল তুলে নিয়ে চিবোতে

লাগল । আচার্যদেব দেখলেন না কিছুই । বুড়ির কিন্তু নজর পড়েছে ঠিকই, তবে কিছুই সে বলল না । ভাবল, ছেলেটির বোধ হয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে !

কিন্তু দ্বিতীয় দিনও কুমার সেই পথে যেতে যেতে আবার তুলে নিল একমুঠো । বুড়ি দেখে ভাবল-"যাক্‌গে, এক মুঠো তিল বৈ তো নয় ! আর না নিলেই হ'ল !" কিন্তু আর একদিনও গুরুদেবের পিছু পিছু যেতে যেই একমুঠো তিল তুলছে অমনি বুড়িও পড়ল ঝাঁপিয়ে—"তুমি কেমন ছেলে গা ?--রোজ রোজ চুরি করে খাও, দু'দিন কিছুটি বলিনি ! গুরুর সঙ্গে থেকেই এই,—আড়ালে কি হবে তা ধর্মই জানেন ।

বুড়ির কথা থামে না, রাগও পড়ে না—"এমন ছেলে, যে আমার সর্বস্ব লুট করে খাবে !"—ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে বুড়ি ।

আচার্য একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন, বুড়ির চিৎকার শুনে ফিরে এসে বললেন—"কি হয়েছে, মা ?" বুড়ি, একে একে বলল কুমারের তিল চুরির কথা । চুরি একবার নয়, দু'বার নয়—তিন তিনবার।

আচার্য বুড়িকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন —"তুমি গরীব মানুষ তিলের দাম আমি তোমাকে দিচ্ছি ।"

বুড়ি বলল —"না বাবাঠাকুর, দাম আমি চাই না ছেলেটিকে যেন একটু শিক্ষা দেন ।"

আচার্যদেব বললেন—"হ্যাঁ মা, এমন শিক্ষা দেব যাতে জীবনে আর অমন কাজ না করে ।" তাঁর আদেশ মতো শিষ্যেরা দু'হাত ধরে কুমারকে নিয়ে এল গুরুদেবের সামনে। গুরুদেব বেশ গম্ভীর গলায় কুমারকে বললেন,—"কি, তুমি সুশিক্ষা করতে এসে কুশিক্ষা শুরু করেছ ? এর শাস্তি নিতে হবে—অপরাধের মূল উপড়ে ফেলতে হয় শুরুতেই ।"— এই বলেই হাতের লাঠিটি দিয়ে তিনটি জোর ঘা লাগালেন কুমারের পিঠে ।

কুমার হ'ল রাজকুমার ! আর তাকেই সবার সামনে এমন চোরের মত প্রহার ? তাও তিন মুঠো তিলের জন্যে । রাগে কুমারের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল; তবে প্রকাশ্যে কিছুই

বললে না । গুরুদেব মুখ দেখেই বুঝলেন—কুমারের মনের ভাবখানা কি ? ভাবলেন,—দেখি, পরিণতিটা কি রকম দাঁড়ায় ।

এরপর খুব মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ করল কুমার—কিন্তু দিন দিনই পিঠের প্রহারটা যেন বিষের মতো তার মনটা ছেয়ে ফেলল । কিছুতেই শাস্তির কথা সে ভুলতে পারল না; মনে মনে ভাবল, এর পরিণাম না দেখে ছাড়বে না ।

শিক্ষা-শেষে যথোচিত ভাবেই সে গুরুর পদ-বন্দনা করল আর বিদায় কালে বারবার অনুরোধ করে গেল—"গুরুদেব, আমি রাজা হলে আপনার কাছে লোক পাঠাব । আপনি যেন তখন একবার রাজপুরীতে পায়ের ধুলো দেন ।"

স্মৃতি-জ্বালা

কুমার ফিরে এল রাজধানীতে বাপ—মায়ের কাছে । রাজা ছেলের পড়াশোনার পরিচয় পেয়ে বড়ই খুশি হলেন, ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তুমি বিদ্যা শিক্ষা করে যোগ্য হয়েছ, আমার নিজের চোখেই তা দেখবার যখন সৌভাগ্য হ'ল – এবারে আমি বেঁচে থাকতেই রাজ্যভার গ্রহণ কর তুমি ।"

তাই রাজা হ'ল কুমার, শান্তিতে করতে লাগল রাজত্ব—কিন্তু তখনো অন্তরে জ্বলছে একটিমাত্র অশান্তি । সেই অশান্তির স্মৃতি—অগ্নিশেলের মতো পুড়ে যাচ্ছে সারাটা অন্তর । অন্তরের এই শেল তুলে ফেলতেই হবে । কুমার এই উদ্দেশ্য গোপন রেখে দূত পাঠাল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে ।

গুরুদেব ভাবলেন, কুমার বয়সেও এখন তরুণ, রক্ত এখনো গরম—যাওয়াটা ঠিক হবে না এখনো। নানা কাজের কথা বলে তাই তিনি ফিরিয়ে দিলেন দূতকে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কুমার দূতকে গুরুদেবের কাছে কেন পাঠালেন ?
2. কুমার গুরুদেবকে কেন শাস্তি দেবার কথা বললেন ?

তারপর বেশ কয়েকটা বছর পরে গুরুদেব স্বয়ং বিনা আমন্ত্রণেই এসে উপস্থিত হলেন রাজসভায়। মনে মনে ভাবলেন—রাজার এবারে নিশ্চয়ই ক্রোধের শান্তি হয়েছে ।

কিন্তু তা হয়নি । পিঠের সেই জ্বালার চেয়েও দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে কুমারের অন্তরের জ্বালা। গুরুকে দেখেই কুমার জ্বলে উঠল রাগে । চোখ দু'টি লাল হয়ে উঠল, সব শরীর কাঁপতে লাগল, কুমারকে একদিন কি—না এই ব্যক্তিই নিজ হাতে প্রহার করেছিল—চোরের মতো ।

কুমার তখন সভাসদদের বলল—"শুনুন আপনারা, এই গুরুই একদিন আমাকে নিজ হাতে নৃশংসভাবে আঘাত করেছিলেন—তাও কি-না একমুঠো তিল খাওয়ার জন্যে । তখন আমার কিছুই বলবার উপায় ছিল না— কিন্তু এখন ? এতদিন আমি বুকের আগুন পুষে রেখেছিলাম; আজ ইনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, ভালোই হয়েছে । এখান থেকে আর সশরীরে ফিরে যেতে হবে না।" এই কথা শুনে সভাসদেরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল—তারা একবার রাজার দিকে আর একবার গুরুর দিকে তাকাতে লাগল । কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না । কে কী বলবে?

গুরু কিন্তু তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে একটুও বিচলিত হলেন না । প্রশান্ত মুখে কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন শুধু —কিশোর বয়সে ছাত্র হয়ে এসেছিল এই কুমার, আর তিনি আচার্য হয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন--যেমনটা দেওয়া উচিত । গুরুর কর্তব্য তিনি যথোচিত ভাবেই পালন করেছেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শেষ শিক্ষার দক্ষিণা স্বরূপ কুমার গুরুদেবকে কী দিতে চাইলেন ?
2. রাজপুরোহিতের বিশিষ্ট পদটি কুমার কাকে দিলেন ?

শেষ—শিক্ষা

গুরু ধীরে ধীরে বললেন—"ভেবেছিলাম কুমার, তোমার শিক্ষা সমাপ্ত করেই তুমি ফিরে এসেছ। কিন্তু এখন দেখছি শিক্ষা একটু বাকী রয়ে গেছে । আজ আমার শেষ-শিক্ষাদানের দিন, আর তোমারও শেষ—শিক্ষা পাবার দিন; মৃত্যুর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে না, দুঃখ তোমার জন্যে।"

তারপর গুরু আবার বলতে লাগলেন—"দেখো মহারাজ, একটুখানি বিবেচনা করে দেখলেও তোমার রাগ পড়ে যেত । ভাবো, তুমি কি ছিলে আর কী হয়েছ ! এমনটা হ'ল যার জন্যে, তার উপরেই তোমার রাগ ?

তুমি যখন চুরিতে সবে হাত দিয়েছিলে—তখনি যদি তোমাকে কঠিন শাস্তি না দিতাম তবে আজ তুমি থাকতে কোথায়? ঐ সিংহাসনে নয়—কারাগারে ! রাজা হতে না, হতে দাগী চোর । তারপর খুনী আসামী !

আর, তোমার বাবার বিচারেই তোমার দন্ডটা তখন কি রকমটা হতো ভাবো দেখি ! তাছাড়া তুমি তখন অমন চরিত্র নিয়ে রাজা হলেও প্রজারা কি তোমাকে মানত, না ভালোবাসত ? সত্যি বলতে--আমিই তোমাকে সেই চোর থেকে রাজা করেছি, কারাগার থেকে সিংহাসনে তুলেছি । এখন তুমিই

ভেবে দেখো !

সভাসদেরা সব শুনে একবাক্যে বলে উঠল—"মহারাজ, আপনার গুরুর আশীর্বাদেই আপনি আজ মহারাজ হয়েছেন—গুরুর আশীর্বাদেই আজ আপনার এত প্রভাব-প্রতিপত্তি ।"

গুরুদেবের কথা শুনে কুমারের অন্তরে যেন নতুন করে আর এক ঘা লাগল—প্রচণ্ড ঘা ! মর্মান্তিক অনুশোচনায় তাঁর অন্তর পুড়ে যেতে লাগল—এতদিন সে করেছে কী ! এমন গুরুর উপর রাগ করে প্রতিহিংসা পুষে এসেছে ! আজ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় কুমারের চৈতন্য হ'ল, কুমারের দু' চোখে জল নামল!

কুমার অমনি সিংহাসন থেকে নেমে গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল—"গুরুদেব, আমার অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন । এই রাজৈশ্বর্য, এই সিংহাসন আপনিই আমাকে দান করেছেন । এখন এই শেষ-শিক্ষার দক্ষিণা-স্বরূপ আপনি এ সবই গ্রহণ করুন ।"

গুরুদেব কুমারের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন —"তুমি সুখী হও বাবা, রাজ্যে আমার লোভ নেই!"

এরপর কুমার স্বয়ং গিয়ে গুরুদেবকে সপরিবারে নিয়ে এলেন বারাণসীতে—আর তাঁকেই সমাদরে বরণ করলেন রাজপুরোহিতের বিশিষ্ট পদে ।

জেনে রাখো ঃ

নিরালা — নির্জন

গুরুদক্ষিণা — গুরুর প্রণামী

যথোপযুক্ত — যেমন করা উচিত

প্রহার — মার, আঘাত

নৃশংস — নিষ্ঠুর

স্তব্ধ — চুপচাপ

অনুশোচনা — গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ

কৃতজ্ঞতা — উপকার মনে রাখা

আচার্য — গুরু

কর জোড়ে — হাত জোড় করে

সান্ত্বনা — বোঝানো

মর্মান্তিক — অতি করুণ

প্রতিহিংসা — হিংসার বদলে হিংসা

'বুদ্ধ জাতক' কথার পরিচয়

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের অনেককেই নীতি-শিক্ষা দিতেন সরল ও মনোরম গল্পের সাহায্যে। গল্পচ্ছলে শিক্ষা খুব সহজেই হৃদয়গ্রাহী হতো, তাই লোকে গল্পের মধ্য দিয়ে শিখত ধর্মের মর্ম-কথা ।

বুদ্ধের পূর্বজন্ম-সমূহের স্মৃতি কাহিনিই শত শত জাতক কথায় রূপ পেয়েছে । দান-ধ্যান প্রজ্ঞা, সত্য, মৈত্রী—বুদ্ধের পূর্বজন্মের এই সব বিশিষ্ট চরিত্রধর্মকেই আশ্রয় করে জাতক কথা রচিত । এগুলি কথা বুদ্ধেরই নিজ মুখে কথিত হয়েছে এক এক ঘটনা-সূত্রে । মূল জাতকগুলি 'পালি' ভাষায় লেখা । স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র ঘোষের অনূদিত 'জাতক কাহিনী' গ্রন্থের 'তিলমুষ্টি জাতক' হতে আলোচ্য কাহিনিটি নেওয়া হয়েছে ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. **রাজপুরীতে শুধু** ..... **আয়োজন ।**
(সুখভোগের, দুঃখভোগের)

2. **গুরুগৃহের যারা** ..... **তাদের দক্ষিণা দিতে হয় না।**
(কাজকর্ম করে, কাজকর্ম করে না)

3. **কুমারের ক্ষুধার তাড়নায় মনে মনে** ..... **প্রতি লোভ জন্মাতে লাগলো ।**
(খাদ্যের, পানীয়ের)

4. **আমিই তোমাকে চোর থেকে** ..... **করেছি ।**
(ডাকাত, রাজা)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. ব্রহ্মদত্ত কেন কুমারকে রাজপ্রসাদ থেকে দূরে কোথাও শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতে চাইলেন ?
6. বুড়ি প্রথম দু'দিন কেন কুমারকে কিছু বলেননি ?
7. তিল চুরির জন্য কুমার গুরুর কাছে কী শাস্তি পেলো ?
8. সভাসদ্‌রা গুরুমশায়ের কথা শুনে কী বললেন ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

9. তৃতীয় দিনে তিলে হাত দিতেই বুড়ি কেন চিৎকার জুড়ে দিল ?
10. কুমারকে শিক্ষা গ্রহণকালে শাস্তি না দিলে কী হতো ?
11. গুরুদেব কুমারের প্রথম আমন্ত্রণ কেন উপেক্ষা করেছিলেন ?
12. গুরুদেবকে রাজসভায় ডেকে কুমার কেন অপমান করেছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

13. কুমারের মনে গুরুদেবের প্রহার কী প্রভাব ফেলেছিল ?

14. গুরুদেব আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে একটুও বিচলিত হলেন না কেন ?

15. গুরুদেবের কাছে কুমার কেন ক্ষমা ভিক্ষা করলেন ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

অহংকার	যথোপযুক্ত	যথোচিত
স্বেচ্ছা	কারাগার	বিদ্যালয়

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

রাজা	বুড়ি	ছেলে
তরুণ	ছাত্র	কিশোর

3. এক কথায় প্রকাশ করো ঃ

যার দুই হাত সমান চলে

কান অবধি বিস্তৃত

যা দেখা যায় না

তুলনা করা যায় না

4. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

বড়দের প্রতি কেমন ব্যবহার করবে ?

পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

সাধুজীর স্টীমার খাওয়া

অধ্যাপক

অনেক বছর পরে সেবার শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গেছেন । উঠেছেন মামার বাড়িতে । বনফুল সেই সময় ছিলেন ভাগলপুরের বাসিন্দা । বনফুল সাহিত্য জগতে আসার আগেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের বাস ছেড়েছেন, তাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বনফুলের আলাপ-পরিচয় ছিল না । এবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছাড়তে রাজি হলেন না বনফুল । একদিন তিনি হাজির হলেন শরৎচন্দ্রের মামার বাড়িতে । শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ার নল পরিষ্কার করতে করতে স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে গল্প-সল্প করছিলেন। বনফুল প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিলেন ।

পরিচয় পেয়ে শরৎচন্দ্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'তোমার অনেক লেখা পড়েছি । বেশ সুন্দর লিখেছো। তুমি যে ভাগলপুরের ছেলে তা তো জানতুম না ? জানলে আলাপ করার জন্য তোমাকে আগেই ডেকে পাঠাতুম । তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোসো, বোসো ।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ি কোথায় ছিল ?
2. শরৎচন্দ্রের সাথে বনফুলের কোথায় আলাপ হয়েছিল ?
3. 'এ তোমার বিনয় ভাই । তোমার লেখা বেশ ভালই হচ্ছে'। এই উক্তিটি কে কার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ?

বৈঠকখানায় ঢালা ফরাস পাতা । ফরাসে বসে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জিত বনফুল বললেন, 'আপনি যে আমার মতো একজন সামান্য লেখকের লেখা পড়েছেন সে আমার পরম সৌভাগ্য ।'

'এ তোমার বিনয় ভাই । তোমার লেখা বেশ ভালোই হচ্ছে ।'

বনফুল নিজের প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্যে বললেন, 'ওসব প্রসঙ্গ আজ থাক, আজ বরং আপনি একটা গল্প শোনান ।'

'কি গল্প তোমাকে শোনাই বলো তো ? তা বেশ, এই ভাগলপুরেরই একটা গল্প শোনাই । আমার ছেলেবেলাকার একটা সত্য ঘটনা ।'

বৈঠকখানার উপস্থিত লোকেরা গল্পের গন্ধ পেয়ে খুশি। শরৎচন্দ্র মজলিসী মেজাজে গল্প ধরলেন।

'তখন আমি স্কুলে পড়ি । সেই সময় আমাদের আদমপুরের ঘাটে এলেন এক আশ্চর্য সাধু । অসাধারণ না কি তাঁর ক্ষমতা । পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, সারা গায়ে ছাই মাখা । ভাগলপুরময় দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়লো । কয়েক দিনের মধ্যেই আদমপুরের ঘাট দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠলো ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. খবরটা ভাগলপুর ও তার আশে পাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো । কোন খবরটির বিষয়ে বলা হচ্ছে ?
2. হাজার হাজার লোক প্রচন্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে কিসের জন্য অপেক্ষা করছিল ?
3. সাধুজী গম্ভীর হয়ে কোন্ দিকে এগিয়ে চললেন ?

শুনতে পেলুম, সাধুজী নাকি ভক্তদের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছেন, শূন্য থেকে খাবার বের করছেন, ঝোলা থেকে বের করছেন অসময়ের আম । সাধুজীর অলৌকিক কান্ডকারখানা দেখে লোকেরা তাজ্জব বনে যাচ্ছে । ইতিমধ্যে অনেকে না কি দীক্ষাও নিয়ে নিয়েছে শুনলুম ।

একদিন সাধুজীর গঙ্গাপুজো করার ইচ্ছে হলো । শিষ্যদের তাঁর ইচ্ছের কথা বলতেই পরদিন শিষ্যরা পুজোর নানা উপকরণ নিয়ে হাজির হলো আদমপুর ঘাটে । সাধুজীর নির্দেশে গঙ্গাতীরে পবিত্র জলের কাছ ঘেঁসে থরে-থরে সাজানো হলো-ফল ফুল, বাতাসা, পেঁড়া ।

বেলা প্রায় বারোটা, সাধুজী সবে পুজোয় বসবেন, এমন সময় একটা দারুণ কান্ড ঘটে গেল। কার কোম্পানীর একটা জাহাজের মতো বড় স্টীমার তখন রোজই ঐ সময় আদমপুর ঘাটের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বিরাট বিরাট ঢেউ তুলে যেত । সেদিন সেই প্রচন্ড ঢেউগুলো এসে হঠাৎই আছড়ে পড়লো গঙ্গামায়ীকা পুজোর নৈবেদ্যের ওপর । মুহূর্তে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল গঙ্গায় । শিষ্যরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো ।

সাধুজী গেলেন ক্ষেপে—এত বড় স্পর্ধা। আমার গঙ্গামায়ীর পুজো নষ্ট করা ! ঠিক হ্যায়! কাল তুই বেটা জাহাজ পালাবি কোথায় ? এদিক দিয়েই তো যেতে হবে । তখন তোকে আস্তো গিলে খাবো। হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করলুম সত্যিই তোকে গিলে খাবো কাল ।

ভক্ত, শিষ্য ও উপস্থিত দর্শকরা তো সাধুজীর কথা শুনে অবাক ! সাধুজীর কি অসম্ভব প্রতিজ্ঞা! অতো বড় একটা জাহাজকে কি আস্তো গেলা সম্ভব !

একজন শিষ্য সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললো—গুরুজী ও যে জাহাজ খাবেন কি করে ?

গুরুজী চিৎকার করে উঠলেন—কালকেই তা দেখতে পাবি বেটা । আমার প্রতিজ্ঞার কোন নড়চড় হবে না ।

ওই জাহাজকে আমি গিলে খাবোই । কালকে বেটা বুঝতে পারবে আমার পুজো ভাসিয়ে দেওয়ার কি ফল ।

শিষ্য ও ভক্তদের অনেকেরই ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না । একজন শিষ্য হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—গুরুজী কা জয় ! অমনি সুর মিলিয়ে অনেকে চেঁচিয়ে উঠলো । একজন শিষ্য বললো—গুরুজী মহাপুরুষ, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই । জাহাজ গেলা তো অতি সামান্য কথা ।

শিষ্যের কথা শেষ হতেই ভক্তিরসে আপ্লুত ভক্তরা আবার সাধুজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সাধু কোথায় এসেছিলেন ?
2. আদমপুরের ঘাট দর্শনার্থীদের ভিড়ে কেন জমজমাট হয়ে উঠল ?
3. সাধুজী কেন ক্ষেপে গেলেন ?

দেখতে দেখতে খবরটা ভাগলপুর ও তার আশেপাশে বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো ।

পরদিন সকাল থেকেই আদমপুর গঙ্গার ঘাটে প্রায় মেলা বসে গেল । যত বেলা বাড়ে ততই বাড়ে লোকের ভিড়। গিজগিজে ভিড়ে একটুও জায়গা না পেয়ে অনেকেই আশেপাশের গাছে উঠেছে। অনেকে গঙ্গায় নেমে দাঁড়িয়েছে ।

সাধুজী ঘাটের কাছে ধুনি জেলে গভীর ধ্যানে মগ্ন । এগারোটা বেজে গেল । সাড়ে এগারোটা বেজে গেল । বারোটা প্রায় বাজে । সাধুজীর ধ্যান ভাঙার নাম নেই । হাজার হাজার লোক প্রচন্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে কী হয় ! এমন সময় দূরে জাহাজের মতো বিরাট স্টীমারটাকে দেখা গেল। জনতা চিৎকার করে উঠলো—আসছে, আসছে, জাহাজটা আসছে ।

সাধুজীর এবার ধ্যান ভাঙলো । চোখ মেলে তাকালেন । তারপর গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে । সে কি পদক্ষেপ, যেন রবি বর্মার আঁকা শিবের গঙ্গাবতরণের ছবি।

কোমরজলে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন সাধুজী । তারপর হঠাৎ তাঁর বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠলেন– আয় বেটা জাহাজ ! আজ তোকে আমি গিলে খাব । কারো সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়।

সাধুজী যত চেঁচায় আমাদেরও ততো বুক ঢিপঢিপ করে । বুঝতে পারছিলুম এইবার একটা বিরাট অঘটন ঘটে যাবে । সাধুজীর শরীরটা দ্রুত বাড়তে থাকবে । তারপর তিনি এক বিশাল হাঁ মেলে স্টীমারটাকে একটু একটু করে গিলে ফেলবেন ।

এতো হাজার হাজার লোকের বিশাল ভিড়, তবু ওই মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ জুড়ে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা । সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে ।

প্রচন্ড গর্জনে - ঢেউ তুলতে তুলতে এসে পড়লো

পড়ে কী বুঝলে ?

1. হাজার হাজার লোকের বিশাল ভিড় তবু ঐ মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ জুড়ে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা কেন ?
2. সাধুজী বিরাট এক হাঁ করে কার দিকে এগোতে লাগলেন ?
3. জাহাজটা কাদের জন্য বেঁচে গেল ?

স্টীমার । ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো ঘাটে। সাধুজী হুঙ্কার করে বিরাট এক হাঁ করে এগুতে লাগলেন জাহাজের দিকে । আর ঠিক অমনি সময় জনা দশ-বারো সাধুজীর শিষ্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে সাধুজীর পা জড়িয়ে ধরলো—গুরুজী, জাহাজের কয়েকশ লোকের জীবন আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি ওদের বাঁচান গুরুজী । যাত্রীরা তো কোন অপরাধ করেনি । জাহাজের দোষে ওদের কেন প্রাণ নেবেন ?

শিষ্যদের কান্নাভেজা অনুরোধে গুরুজীর মন নরম হলো । ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন-- তোদের জন্যই জাহাজটা বেঁচে গেল । তারপর স্টীমারের দিকে তাকিয়ে বললেন—যা বেটা, খুব জোর বেঁচে গেলি ।

উৎকণ্ঠিত ভক্তরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো । যারা তামাসা দেখতে এসেছিল, তারা নিরাশ হয়ে ফোঁ-স করে এক নিঃশ্বাস ফেলে বললো— যত্তো সব—'

জেনে রাখো ঃ

রবি র্বমা — উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শিল্পী রাজা রবি বর্মা । তাঁর জন্ম দক্ষিণভারতের তিরুঅনন্তপুরমের কাছে কিলিমানুর গ্রামে । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি থেকে বিষয় নির্বাচন করে ছবি এঁকেছেন । এছাড়া নর-নারীর বাস্তব জীবনকে নিয়ে আঁকা ছবিগুলি যেন ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. **বনফুল সেই সময়ে ছিলেন** ..... **বাসিন্দা ।**

(কলকাতার, মণিহারীর, ভাগলপুরের)

2. **বৈঠকখানায় ঢালা**..... **পাতা ।**

(চাদর, ফরাস, মাদুর)

3. **শরৎচন্দ্র মজলিশী**..... **গল্প ধরলেন ।**

(মেজাজে, খেয়ালে, চালে)

4. **সাধুজি সবে পুজোয় বসবেন, এমন সময় একটা দারুণ ..... ঘটে গেল ।**

(কান্ড, ঘটনা, ব্যাপার)

5. **শিষ্য ও ভক্তদের অনেকেরই ..... ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না ।**

(ঘটনাটা, ব্যাপারটা, কান্ডটা)

6. **পরদিন সকাল থেকেই আদমপুরের গঙ্গার ঘাটে প্রায়..... বসে গেল ।**

(মেলা, বাজার, হাট)

7. **সাধুজী যত চেঁচায় আমাদেরও ততো বুক..... করে ।**

(টিপ্‌টিপ, ধর্‌ফর্‌, ওঠা-নামা)

9. **জাহাজের দোষে ওদের কেন..... নেবেন ?**

(প্রাণ, জীবন, মস্তক)

10. **শিষ্যদের কান্নাভেজা..... গুরুজীর মন নরম হলো ।**

(অনুরোধে, অনুযোগে, অভিমানে)

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. ভাগলপুরে কোন্ দুজন লেখকের দেখা হোল ?

12. সেদিন শরৎচন্দ্রের গল্পের মেজাজ কেমন ছিল ?

13. সাধুজির বেশভূষা কেমন ছিল ?

14. সাধুজী ঝোলা থেকে কী কী বের করেছিলেন ?

15. সাধুজি হঠাৎ কেন ক্ষেপে গেলেন ?

16. সাধুজির শরীরটা হঠাৎ কেন বাড়তে থাকবে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

17. আদমপুর ঘাটে শরৎচন্দ্রের দেখা আশ্চর্য সাধুর বর্ণনাটি নিজের ভাষায় লেখো ।

18. সাধুজী কেন ক্ষেপে গেল ? সে কী প্রতিজ্ঞা করল ? লেখো ।

19. সাধুজীর স্টীমার গিলে খাওয়ার যে অভিনয় অনেক লোকের ভিড়ের মাঝে করল তার বর্ণনা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ**

দর্শনার্থী	গঙ্গাবতরণ
দুরারোগ্য	পরিষ্কার

2. **লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ**

মামা	নাতনি
ছেলে	লেখক
শিষ্য	ভাই

3. **বাক্যগুলি চলিত ভাষায় লেখো ঃ**

তিনি ভাগলপুরে গিয়াছেন । একটি জাহাজ ঢেউ তুলিয়া যাইত । এগারোটা বাজিয়া গেল । সাধুজী চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন ।

সুভাষ স্মৃতি

বাসন্তী দেবী

আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে খালি বার বার মনে পড়ছে।

সুভাষ সেই যে গেল—আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা এখনও আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা আর কি করে জোর করে বলি। শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা।

কেমন খ্যাপাটে ছিল ও, শোনো। আমার ওপর ওর যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। বলা নেই, কওয়া নেই, সারাদিন কোথায় ঘুরত ফিরত। রাত ১১ টার পরে দুম্ করে এসে হাজির আমার কাছে। এসেই হুকুম—'শীগ্‌গির খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কে, সেই যে গেল আর এলোনা ?
2. দেশের লোকেরা কেন দিশেহারা ?
3. "শীগ্‌গির খেতে দিন খিদে পেয়েছে", কে বলেছিল ?
4. কে বলেছিল ? "আমি জন্মই দিয়েছি, কিন্তু ওর মা তো আপনি"।

আমি বলি, 'ওমা সেকি কথা। খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ, কাজের লোকেরা সব পাট চুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি !'

বাবু কি আর সে কথা শোনেন ! আবদার ধরে বসেছেন—'কেন, ভাতে ভাত খাব।'

তবু বোঝাই, 'ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওদিকে যে তোমার মা না খেয়ে-দেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে'।

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত ওই রাত্রে যা হোক দুটো সেদ্ধ করে, আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে বলে ভাতে-ভাত রেঁধে, পেট ঠান্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমারও রেহাই পাবার কোনো উপায় ছিল না। তাই বুঝি ওর মা আমাকে প্রায়ই একথা বলতেন—'ওর আমি জন্মই দিয়েছি—কিন্তু ওর মা তো আপনি।'

এমনিতে সঙ্কল্পে কঠোর হলেও মনের ভেতরে ওর যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না।

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ি এসেছে— এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, এই অবকাশে বোধ হয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন লোক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

শেষে বলি — হ্যাঁ, সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, আর ওই বেচারা যে তোমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে— ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে।'

সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, 'ভিজুক ব্যাটা দাঁড়িয়ে, যেমন পেছনে লেগেছে।

আমি বলি, তা ওর কী দোষ বলো। বেচারার চাকরি বাঁচাতেই না এই কষ্ট। কিন্তু ওর তো বাড়িতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলেমেয়ে কিংবা ভাই-বোন আছে। ভেবে দেখো তো, ওর জন্য তাদের কত ভাবনা হচ্ছে'—

এটুকু বলতেই দেখি সুভাষের চোখ সজল, কোনোমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লজ্জিতও হ'ল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম—অন্যের কষ্ট ও যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না— এমন কি, কানে তেমন কিছু শোনামাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কার পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত ?
2. সুভাষ 'বি. পি. সি.' র কোন পদে ছিলেন ?
3. সুভাষ কাকে বলেছে ভিজুক ব্যাটা ?

সেই সুভাষ।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে — ঠিক করলাম আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে।

সুভাষ তো কিছুতেই রাজি হবে না । অথচ সে তখন 'বি পি সি'র প্রেসিডেন্ট । তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে না । সে বলে, 'আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা । এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি ।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি – কিন্তু সে কি বোঝে ! অনেক করে বুঝিয়ে শেষে রাজি করালাম। ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ দিলাম । ওঁর সম্মতি তো আগেই পেয়েছি । আমি, আমার ননদ ঊর্মিলা দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেফতার হলাম ।– আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল বটতলা থানায় ।

এদিকে আমাদের গ্রেফতারের খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা । সেই জনতাকে কোনো শক্তি দিয়ে রোখা যাচ্ছে না ।

পুলিশ অফিসারকে বললাম, আমাদের বাড়ির গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে দিতে—সেই গাড়িতেই আমি জেলে যাবো, নইলে ওঁদের গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না ।

আমরা লালবাজারে এলে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে । মজার কথা শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেফতার হলাম কেন !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. তখন কোন আন্দোলন চলছিল ?
2. আন্দোলনে কোন মহিলারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ?
3. কাকে অনেক করে বুঝিয়ে রাজি করা হোল ?
4. কে খবর পেয়ে রাত দুটোয় হাজির হোল ?
5. সুভাষ কাকে খুবই ভালবাসতো ?

কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা বিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী—আর একদিকে আইন । যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হ'ল ।

গেলাম জেলে ।

ওমা, রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি ।

কী ব্যাপার ?

মুক্তির আদেশ এসে গেছে । চলে যেতে হবে ।

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম—'রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো ।'

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির ।

রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ি ।

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহা ক্ষুণ্ণও হলেন ।

—'ফিরে এলে ?'

— 'কী করবো ? ছেড়ে দিলে যে'।

রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে । মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার ।

বুঝলাম, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি ।

হেসে বললাম—'কি, এবার হয়েছে ? ফিরে তো এলাম; আর কেন ?

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হ'ল বর্ষণ । সুভাষের সে কী কান্না । কী ভালোই সে বাসতো আমাকে ।

জেনে রাখো ঃ

সংকল্প	—	দৃঢ়প্রতিজ্ঞা	**সাব্যস্ত**	—	সিদ্ধান্ত
ঊর্ধতণ	—	উঁচুস্তরের	**প্রেসিডেন্ট**	—	অধ্যক্ষ

লেখক পরিচয় ঃ

বাসন্তী দেবীর জন্ম ১৮৮০ সালের ২৩ শে মার্চ । তাঁর বাবা বরদানাথ হালদার ছিলেন এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী । বাসন্তী দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী । স্বামীর রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে শুধু তাঁর সমর্থন নয়, সে সব কাজকর্মে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন । সুভাষচন্দ্রকে তিনি নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন । চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলে 'বাঙলার- কথা' পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন । ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন । ১৯৭৪ সালের ৭ই মে বাসন্তী দেবীর মৃত্যু ঘটে ।

পাঠ পরিচয় ঃ

এই পাঠে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি । বাসন্তী দেবী সুভাষকে খুবই ভালোবাসতেন। তাই সুভাষ তাঁর কাছে আবদার করাটা নিজের মায়ের মত অধিকার মনে করতেন। লেখিকা সুভাষের চরিত্র চিত্রণ করেছেন এই পাঠের মাধ্যমে । সুভাষ নিজেকে কঠোর দেখালেও অন্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও কোমলতা ছিল, তা এই পাঠের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকাও স্পষ্ট হয়েছে ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **দেশের..... মানুষ তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা ।**

(শত শত / কোটি কোটি)

2. **বলা নেই..... সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত ফিরত ।**

(কওয়া নেই / দেখা নেই)

3. **ও যেখানে যেতো ওর পেছনে..... লেগে থাকত ।**

(পুলিশ / গোয়েন্দা)

4. **সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, ... ব্যাটা দাঁড়িয়ে ।**

(ভিজুক / থাকুক)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. সকাল থেকে কার কথা লেখিকার বার বার মনে পড়ছে ?
6. কে বলল "এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি !"
7. শেষ পর্যন্ত বাসন্তী দেবী সুভাষের খাবার সম্বন্ধে কী করলেন ?
8. সুভাষের মা বাসন্তী দেবীকে কী বোলতেন ?
9. বাসন্তী দেবী সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছিলেন না কেন ?
10. অসহযোগ আন্দোলনে কারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন ?
11. তাঁদের গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে কারা কী ঘেরাও করেছিল ?
12. সবশেষে সুভাষের কান্নার কারণ কী ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

13. সুভাষের প্রতি লেখিকার ভালোবাসার পরিচয় দাও ।

14. 'সুভাষ অন্যের কষ্ট কিছুতেই সহ্য করতে পারত না',কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. কারক কাকে বলে ? কয় প্রকার তার নাম লেখো ।

2. বাক্য রচনা করো ঃ

দিশেহারা	রেহাই
অভিমান	ক্ষুণ্ণ

3. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

উপস্থিত	অনুরোধ
শেষ	কঠোরতা

জেনে রাখো ঃ

ক্রিয়ার সঙ্গে নাম পদের (অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের) সম্বন্ধকেই কারক বলে ।

কারক ছয় প্রকার —

কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ ।

কর্তৃকারকের একটি উদাহরণ লক্ষ্য করো —

যে করে বা যে হয়, সেই কর্তা, কর্তাকেই কর্তৃকারক বলে ।

যেমন – মিনি খেলছে । সমু পড়ছে । 'মিনি' ও 'সমু' এই দুটি পদকে আশ্রয় করে 'খেলছে' ও 'পড়ছে' ক্রিয়া দুটি অর্থ প্রকাশ করছে ।

অপুর অলীক ভীতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক মাস কাটিয়ে গিয়াছে । ভাদ্র মাস ।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল-কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু ? - চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি -বেরিও না যেন ।...

অপু শুনিয়াও শুনিল না--যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে--তবুও সে কি করিতে পারে ?-- এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল--বেরুলি বুঝি !--ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের । গরম গরম খাবি-আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম--ও অপু-উ-উ-

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল । অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে । নীলু বলিল--চল্ অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি ?

অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল । ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে । গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে । অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই— তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গন্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল ! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না । তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল । ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল । সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে— এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই -এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল —ও ভাই অপু !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. অপু খেলতে কার বাড়ি গেল ?
2. শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুয়ে অপু কার কাছে আতুরী বুড়ির গল্প শুনতো ?
   ক. দিদি খ. পিসি
   গ. মা ঘ. বাবা
3. আতুরী বুড়ির উঠোনে কোন গাছ ছিল ?
   ক. আম খ. বিলাতী আমড়া
   গ. জাম ঘ. কাঁঠাল

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল— কি রে নীলুদা ? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠনে গিয়া শেষ হইয়াছে-উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ । তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পুর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী ।

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী !... সন্ধ্যেবেলা কোথায় আসিয়া তাহার পড়িয়াছে ! কে না জানে যে ওই উঠনের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না ! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে— রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার

ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি ?

ঝাপসা দুষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া গেল— বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে...অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই তাহাদের— এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া !...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না ।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল । অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই— এখনই তাহার প্রাণ সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আতুরী বুড়ি অপু-নীলুকে কী দিতে চাইছিল ?
2. আতুরী বুড়ির কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপু কী করলো ?

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল । সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না— আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল— কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না ।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা ? মোরে ভয় কি ?... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধারে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতি এস—আমচুর দেবানি এস-

আমচুর !... ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি !... ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে-এ রকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে ।

এখন সে কি করে !... উপায় ?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল-ভয় কি ও মোর বাবারা ?

মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে ?

আর কি, সব শেষ ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু-রিল ! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত ! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহাকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল-সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো

না-আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে —

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ...বাড়ী, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই... কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রুর দৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ...আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক !...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভরে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল— নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে !...

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি— কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা ? খোকাডা কাদের ?

জেনে রাখো ঃ

অলীক	—	মিথ্যা, অসত্য	**সংকল্প**	—	স্থির করা কাজ
সড়ক	—	রাস্তা	**বিলম্ব**	—	দেরি
হিম	—	বরফ, ঠান্ডা	**মুই**	—	আমি
সাঙ্গ	—	শেষ	**সন্দে**	—	সন্ধ্যা
সুঁড়িপথ	—	সরুপথ	**দেবানি**	—	দেবো
আশঙ্কা	—	সন্দেহ	**আড়ষ্ট**	—	অসাড়
মরীয়া	—	বেপরোয়া	**সম্মুখ**	—	সামনে
আতঙ্ক	—	শংকা	**ধত্তিও**	—	ধরতেও
মাত্তি ও	—	মারতেও	**আর্তরব**	—	আকুল চিৎকার
আসন্ন	—	যা প্রায় এসে গেছে			

লেখক পরিচয় ঃ

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার বনগ্রাম মহকুমায় ব্যারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম । বি. এ. পাশ করে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন । তারপর বিহারের ভাগলপুরে

খেলাৎ ঘোষের জমিদারীতে চাকরি সূত্রে চলে আসেন । এখানেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' রচিত হয় । কিছুদিন পর বাংলাদেশে ফিরে এসে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন । শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় থেকেছেন ।

তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি রচনা করে গেছেন। প্রকৃতি তাঁর রচনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'কিন্নরদল', 'দেবযান', 'চাঁদের পাহাড়', প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্য একাডেমি তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছে । 'পথের পাঁচালী' ইংরেজি ও ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান । ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় ।

পাঠ পরিচয় ঃ

পাঠ্য অংশটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি অংশ বিশেষ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. 'অপুর অলীক ভীতি' পাঠটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসের অংশ ?
2. অপুর মা বিকেল বেলা কী করছিল ?
3. নীলু অপুকে কোথায় যেতে বললো ?
4. অপু - নীলু পথ হারিয়ে কার চালা ঘরের সামনে এসে পড়লো ?
5. অলীক ভীতি কী ছিল ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. অপুর মা কেন অপুকে বেরোতে মানা করছিল ?
7. মায়ের কথা না শুনবার ফলস্বরূপ কোন শাস্তি পেতে চলেছিল বলে অপুর মনে ধারণা হয়েছিল ?
8. আতুরী বুড়ি নীলুর সঙ্গে কী করবে বলে অপু ভাবছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. আতুরী বুড়ির সামনে পড়ে অপুর সে অবস্থা হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো ।
10. আতুরী বুড়ি সম্পর্কে কোন মিথ্যে কল্প কথা গ্রামে শিশুদের মনে ভয় সৃষ্টি করেছিল ? পাঠ অবলম্বনে লেখো ।
11. অপু - নীলুর ভয়ের কারণ আতুরী বুড়ি কেন বুঝতে পারছিল না ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. চলিত ভাষায় লেখো ঃ

যাহার	ডাকিয়া	ঘনাইয়া
হইতি ছিল	গিয়াছে	বলিল

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

পিসি	বুড়ি	রাণী
দিদি	খোকা	ভাই

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

রানী	আরষ্ট	বর্ন
মুর্তি	ফাকি	সন্ধা

4. আমাদের দেশে এখনও ডাইনী সন্দেহে কোনো মহিলাকে মেরে ফেলার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এই ভুল ধারণা আমাদের সমাজকে যে কতটা পঙ্গু করে রেখেছে, সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো ।

জেনে রাখো ঃ

ভাষার দুটি রূপ । একটি লেখার ভাষা সাধুভাষা, অপরটি মৌখিক বা চলিত ভাষা । আগে গদ্য সাহিত্যে কেবল সাধুভাষাই প্রচলিত ছিল । এখন চলিত ভাষায় লেখা হয় । সাধুভাষা নিয়মে বাঁধা কৃত্রিম ও তৎসম শব্দ প্রয়োগ হয় । চলিত ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষা, এইটি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক । কিন্তু একই বাক্যে সাধু ও চলিতভাষার সংমিশ্রণ কখনই করা উচিত নয়।

উদাহরণ —

সাধুভাষা	**চলিতভাষা**
তাহার, তাঁহার	তার, তাঁর
যাহারা, যাহাদিগের	যারা, যাদের
উহারা, উহাদের	ওরা, ওদের
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
দুগ্ধ,	দুধ
পিতা, মাতা	বাবা, মা

দাদুর উত্তর

বনফুল

খোকন তখন ছোট ছিল । মাত্র দশ বছর বয়স । একদিন গঙ্গার ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল সে। ভাদ্রর ভরা গঙ্গায় প্রতিফলিত হয়েছে রঙিন মেঘে ভরা পশ্চিমের আকাশ । আকাশে কত রকম রং । যে সাতটা রং রামধনুতে দেখা যায় তা তো আছেই, তাছাড়া আছে আরও নানা রকম রং যার নাম

খোকন জানে না। ফিকে হলুদের সঙ্গে ফিকে গোলাপী। কালো মেঘের টুকরোটিকে ঘিরে সোনালীর পাড়, বেগুনী আর লালের অদ্ভুত সমন্বয়, নীলের মাঝে মাঝে রূপোলী ছাপ, ওদিকে একটা দৈত্যাকার মেঘ সর্বাঙ্গে আবীর মেখে বসে আছে, পাহাড়ের উপর লাল টুকটুকে শাড়ি পরে হাত তুলে কাকে ডাকছে ওই শ্যামলা রঙের মেয়েটি উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেত হস্তী, তার মুখে লালের আভা আর সর্বাঙ্গ দুগ্ধ - ধবল। একটা রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে। ওপাস থেকে ঝরে পড়ছে একটা আলোর ঝরণা, এ পাশে ছোট ছোট মেঘগুলি ভেসে চলেছে রঙের নদীতে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল খোকন। হাতে ছিল চিনে বাদামের ঠোঙা। হাতে ধরাই ছিল, খেতে ভুলে গিয়েছিল খোকন। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। কী মহোৎসব হচ্ছে ওখানে, অথচ কোন গোলমাল নেই। হাততালি নেই, মাইক নেই।

একটু পরেই কিন্তু খোকন বলে উঠলো-এ কি ? রঙগুলো সব ফিকে হয়ে যাচেছ যে। বদলেও যাচ্ছে। একটা অন্ধকারের পর্দা ঢেকে ফেলছে সব দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে রাত্রি নেমে এলো। খোকন হতভম্ব হয়ে বসে রইলো। তার বারবার মনে হতে লাগলো এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে গেল কেন ? কোথা গেল এত রং ? কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গেল ? চানাচুরের ঠোঙাটার সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠলো সে। চানাচুর বার করে চিবুতে লাগলো, কিন্তু গঙ্গার ধার থেকে উঠতে পারলো না সে। কিসের একটা মোহ তাকে যেন আটকে রাখলো, অনেকক্ষণ। সে অপরূপ দৃশ্য সে এতক্ষণ দেখেছে তা যে আবার আকাশে দেখা দেবে এ আশা তা ছিল না, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে উত্তরটা সে খুঁজছে এত রং কোথায় গেল, তা বোধহয় এইখানেই পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ বসে রইলো, কিন্তু কোনও উত্তর পেল না সে।

বাড়ি ফিরে গেল শেষে। গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সে আরও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু এ সব কথা মনে হয় নি। সব সময়ই সব কথা কি মনে হয় ? হঠাৎ তার মনে পড়লো নিউটন সাহেব আপেলের গাছ থেকে পড়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল গাছ থেকে আপেলটা কিসের টানে মাটিতে পড়ল। আপেল-পড়া তিনি নিশ্চয়ই আগে অনেকবার দেখেছিলেন, কিন্তু একবারই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল আপেল পড়ে কেন ? খোকনেরও একবার মনে হয়েছে এত রং কোথা থেকে এলো, কোথায়ই বা গেল। হয়তো সে-ও একদিন বড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেলবে এর

উত্তর থেকে ।

বাড়ি ফিরে দেখলো মনীশবাবু বসে আছেন । মনীশবাবু তার প্রাইভেট টিউটার । রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসেন । তাঁকে দেখে খোকন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লো । সত্যিই আজ বাড়িতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. খোকনের বয়স কত ?
   ক. আট খ. নয়
   গ. দশ ঘ. বারো
2. রামধনুতে ক'টা রং দেখা যায় ?
3. খোকনের হাতে কী ছিল ?
4. মনীশবাবু কে ?

"খোকন আজ তোমার এত দেরিতে কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"গঙ্গার ধারে বসেছিলাম । কী সুন্দর সূর্যাস্ত যে দেখলাম মাস্টারমশাই ! মেঘে মেঘে কী চমৎকার রং। ভাবছিলাম এত রং আসে কোথা থেকে । আর আসেই যদি, কিছুক্ষণ পরে চলে যায় কেন ? একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল । তাই গঙ্গার ধারে বসে বসে ভাবছিলাম কেন এমন হয়—"

মাস্টারমশাই বললেন—"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে । রং আসে সূর্যের আলো থেকে । পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরছে, তাই আমাদের দিন-রাত্রি হচ্ছে । তাই সূর্যকে সকালে পূর্বদিকে আর সন্ধ্যায় পশ্চিমদিকে দেখা যায় । সূর্য যখন চক্রবাল রেখার কাছে থাকে তখন আলোর রংগুলো আমরা দেখতে পাই, আর তখন সেখানে যদি মেঘ থাকে তাহলে সে রং মেঘে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে, তাই মনে হয় সূর্য ক্রমশঃ সরে সরে উপরের দিকে উঠছে । উপরে উঠলে সূর্যের আলোর রং আমরা দেখতে পাই না, সাতটা রঙে মিলে যে সাদা আলো হয়েছে সেইতেই তখন দেখতে পাই, সে আলোকে আমরা বলি রোদ—",

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"দুপুরে বেলায় সূর্যে রং দেখা যায় না কেন ?

মাস্টারমশায়ের বিদ্যা অল্প । তিনি বিশদ করে ব্যাপারটা খোকনকে বোঝাতে পারলেন না।

বললেন — "যায় না বলেই যায় না । এখন তুমি ইতিহাসটা খোলো দেখি ।"

মাস্টারমশাই সোৎসাহে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন । ইতিহাস শেষ করে ভূগোল, তারপর অঙ্ক — ।

পুরো দুটি ঘন্টা পড়িয়ে বিদায় নিলেন তিনি ।

বাইরের প্রকান্ড হলটার একধারে খোকনের পড়ার টেবিল । আর একধারে একটা খাট । সে খাটে খোকনের দাদু সন্ধ্যের সময় শুয়ে শুয়ে বই পড়েন তামাক খেতে খেতে । মাস্টারমশায় চলে যাবার পর দাদু খোকনকে ডাকলেন ।

"দাদু, শোনো । আজ গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে বুঝি — সূর্যাস্ত দেখলে ?"

"হ্যাঁ, অতি চমৎকার । কিন্তু অত রং এলোই বা কেন, গেলোই বা কেন তা বুঝতে পারলাম না। মাস্টারমশাই বা বললেন তা-ও আমার মাথায় ঢুকলো না ।"

দাদু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন । তারপর বললেন, "আমি কিন্তু উত্তরটা জানি । শুনবে সেটা ?"

"বলো না-"

"সূর্য মহা দাতা লোক । সর্বদা দান করছেন । তাই তাঁর ছেলে কর্ণ দাতাকর্ণ হয়েছিলেন । তিনি সকালে এসেই একবার অজস্র রং দান করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা অস্ত যাবার সময়ও অজস্র রং দান করেন । তাঁর সেই অজস্র দানের ছবি খানিকক্ষণের জন্য আকাশে ফুটে ওঠে । তারপর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে । তাই আর আকাশে দেখা যায় না—"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর খোকনকে কে ডাকলো ?
   ক. বাবা খ. মা
   গ. দাদু ঘ. ভাই
2. সূর্য কী দান করে ?
3. খোকন বড় হয়ে কোথা থেকে সন্ধ্যা ও উষার বর্ণ মহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে ?

"তাই নাকি । পৃথিবীতে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে সে সব রং ?"

"সর্বত্র । তোমার মায়ের মুখে, তোমার বাবার ভালোবাসায়, তোমার বোনের চোখের দৃষ্টিতে সেই রং রূপান্তরিত হয়ে যায় । আমার হাসিতেও হয়তো একটু আছে সেই রং । সবার মধ্যেই আছে । ফুলে আছে, ফলে আছে, পাখির পালকে আছে, প্রজাপতির ডানায় আছে । আমাদের স্নেহে, ভালোবাসায়, ত্যাগে, ক্ষমায় সেই রং লুকিয়ে আছে । সেই রঙেই পৃথিবী রঙিন ।"

দাদুর উত্তরটা খোকনের ভালো লাগলো। এখন খোকন বড়ো হয়েছে । বিজ্ঞানের বই পড়ে সন্ধ্যা

উষার বর্ণমহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে সে । কিন্তু দাদুর উত্তরটা এখনও ভালো লাগে তার। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয় ওইটেই হয়তো সত্যি ।

জেনে রাখো ঃ

দুগ্ধ	—	দুধ	**সমন্বয়**	—	মিলন
আভা	—	দীপ্তি, বর্ণ	**অপরূপ**	—	সুন্দর
অপ্রতিভ	—	অপ্রস্তুত	**শ্বেত**	—	সাদা
তন্ময়	—	একাগ্রচিত্ত	**হতভম্ব**	—	কি করবো ভেবে না পাওয়া, হতবুদ্ধি

লেখক পরিচয় ঃ

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৯ জুলাই, ১৮৯৯ বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 'বনফুল' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম । এই নামেই তিনি বিশেষ রূপে পরিচিত । পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মা মৃণালিনী দেবী । ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ তিনি । ১৯৬২ সালে 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৭৬ - এ পদ্মভূষণ পুরস্কার 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'বৈতরণীর তীরে', 'ডানা', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', 'সপ্তর্ষি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা তিনি । ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

পাঠ পরিচয় ঃ

বনফুল রচিত 'দাদুর উত্তর' একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প । অনেক কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে স্নেহ, ভালবাসা, মমতায় জড়ানো ব্যাখ্যা যে আমাদের মনে বেশি সাড়া জাগায়, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ছোট গল্পটি ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. বনফুলের প্রকৃত নাম কী ?
2. 'দাদুর উত্তর' গল্পটি কার লেখা ?
3. খোকন কোথায় সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিল ?
4. খোকনের মনে সূর্যাস্ত দেখার সময় কোন প্রশ্ন জেগেছিল ?
5. সূর্যের ছেলের নাম কী ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. রামধনুর সাতটা রং ছাড়াও খোকন আরো যে সব রং আকাশের গায়ে দেখেছিল, তা লেখো ।
7. কিসের মোহ খোকনকে গঙ্গার ধারে আটকে রেখেছিল ?
8. সূর্যের প্রকাশের বিভিন্ন রং সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের উত্তর কী ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. 'একটা রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে' কার লেখা, কোন রচনায় এ কথা বলা হয়েছে ? কে কখন এই রূপকথা মূর্ত হতে দেখেছিল ? - এ বিষয়ে নিজের মতো করে লেখো ।
10. সূর্যাস্তের বিভিন্ন রঙ পৃথিবীময় কোথায় ছড়িয়ে পড়ে বলে দাদু যে বর্ণনা দিলেন, তা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

পশ্চিম	ছোট	সূর্যাস্ত
রাত্রি	সচেতন	অন্ধকার

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

মেয়ে	দাদু
মা	বোন

3. বাক্য রচনা করো ঃ

টুকটুকে	হতভম্ব	সচেতন
রোজ	চমৎকার	গোলমাল

4. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তন করো ঃ

রং	গোলাপ	দক্ষিণ
মোহ	পৃথিবী	ভূগোল

5. সন্ধি করো ঃ

দৈত্য + আকার	সর্ব + অঙ্গ
সূর্য + অস্ত	মণি + ঈশ
মধ্য + আকর্ষণ	মহা + উৎসব

গগনে উদিল রবি

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

[শেষ রাত । তখনো অন্ধকারের ঘোর কাটেনি । দূরে পাহাড় নদী আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে । ভোরের পাখির ডাক শোনা গেল ।]

(ভোরের পাখির গান)

আমি ভাই ভোরের পাখি

আসবে যে এক নতুন কবি তার তরে ভাই রাত্রি জাগি
শিরে যে তার বিজয় মুকুট
জয়ের মালা গলে—
হাতে তাহার বাণীর বীণা
বাজছে পলে পলে ।
রাত জাগি ভাই, গান গেয়ে যাই শুধুই তারি লাগি ।

(অন্ধকারের প্রবেশ)

অন্ধকার । কে তুমি যে বে-আক্কেল বেরসিক ব্যক্তি !
সক্কালবেলা ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে আমার আরামের ঘুমটা মাটি করে দিলে । যাও— যাও, এখান থেকে সরে পড়ো —।

ভোরের পাখি । তুমি এমন মারমুখো হয়ে তেড়ে এলে কেন ভাই ? কি তোমার নাম ?

অন্ধকার । (ব্যঙ্গ করে) কি আমার নাম ? এই বনে বাস করছ, আর আমাকে চেন না? আমার পোশাকটা দেখছ ?

ভোরের পাখি । দেখছি বৈ কী ?

অন্ধকার । কি এর রং ?

ভোরের পাখি । ঘোর কালো !

অন্ধকার । ঘোর কালোকে কি বলে ?

ভোরের পাখি । ঘোর কালো মানেই একেবারে অন্ধকার ।

অন্ধকার । ঠিক ধরেছ । আমি অন্ধকারই বটে । তা তুমি এখানে এসে অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছ কেন ?

ভোরের পাখি । ও ! তুমি এখনো শোননি ?

অন্ধকার । কি আবার শুনবো শুনি ? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি !

ভোরের পাখি । এই বনে যে আজ নতুন কবির উদয় হবে। তার আলোতে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠবে ।

অন্ধকার । (বিষম চটে গিয়ে) কী বল্লে ? কী বল্লে? নতুন কবির উদয় হবে ? বনের মধ্যে

আলো জ্বলে উঠবে ? আচ্ছা, সকাল হবার আগে তুমি এমন অলুক্ষণে কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি কিজান না যে, এ বনে চিরকাল অন্ধকার থাকে ? এটা আমার রাজ্য, এখানে কেউ আলো জ্বালাতে পারবে না।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ভোরের পাখি কেন রাত্রি জাগে ?
2. অন্ধকার ভোরের পাখিকে কেমন লোক বলে ভর্ৎসনা করেছিল ?
3. ভোরের পাখি 'ঘোর কালো' মানে কী বলেছিল ?

ভোরের পাখি । এতকাল সেই কথা শুনেই তো ঝিমিয়ে ছিলাম । এইবার কে যেন কানে কানে বলে গেল যে, নতুন কবি আসবে, বনে আলো জ্বলবে, সবাই জাগবে।

অন্ধকার । (ঠাট্টা করে) কে যেন কানে কানে বলে গেল বটে ! কোন্ বে-আক্কেল তোমার কানে কানে বল্লে শুনি ?

(নীল রঙের হাল্কা ওড়না পরে মলয়ার প্রবেশ)

মলয়া । আমি বলেছি গো আমি, সকলের কানে কানে শুভ বারতা শোনানোই যে আমার কাজ ।

অন্ধকার । বটে শুভ বারতা । তা কি শুভ বারতাটি তুমি বয়ে নিয়ে এসেছ শুনি? তোমার পরিচয়ই বা কী ?

মলয়া । আমার পরিচয়? অন্ধকারে যারা মুখ গোমড়া করে বসে থাকে, তারা আমার পরিচয় কি করে পাবে ?

অন্ধকার । আহা ঃ অত গুমরই বা কেন ? এ বনে তুমি ঢুকলে কি করে ? লক্ষ্মী মেয়ের মত পরিচয়টা আগে দিয়ে ফেলতো ।

মলয়া । আমার নাম মলয়া । ফুরফুর করে আমি বয়ে চলি । দেশ দেশান্তরে আমার অবাধ গতি । এই বন এতদিন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ছিল । তাই তো আমি আমার নীল ওড়না উড়িয়ে এলাম শুভ বারতা দিতে ।

অন্ধকার । কিন্তু তুমি কি জান না যে, এই বনের মালিক আমি ? এখানে অন্ধকারের রাজ্যি ? তোমাদের ফুরফুরে হাওয়া আর প্যানপ্যানে গান এ বনে চলবে না আমি যতদিন আছি । এই তোমাদের সোজা কথা বলে দিচ্ছি ।

ভোরের পাখি । তুমি তো সোজা কথা বলে দিলে । কিন্তু আমার গলা থেকে যে আপনা আপনিই গান বেরুচ্ছে ।

অন্ধকার । এই অন্ধকার রাজ্যে কথা শুধু একটি থাকবে, আর সেটি হচ্ছে আমার মুখের কথা— এই অন্ধকারের আদেশ বুঝলে ?

মলয়া । কিন্তু আমি যে চিঠি নিয়ে এসেছি—সে চিঠি বিলি করবো কার কাছে ?

অন্ধকার । (আঁতকে উঠে) চিঠি ! চিঠি আবার কিসের ? তুমি তো মেয়ে বাপু সুবিধের নও । প্রথমে বল্লে শুভ বারতা । এখন বলছ চিঠি ।

মলয়া । কিন্তু দেশ বিদেশে,বনে বনান্তরে সবুজের লিখন বয়ে নিয়ে যাওয়াই যে আমার কাজ । আজ আমি এসেছি এই অন্ধকারের বনে চিঠি বিলি করতে । সে লিখন আমি কার হাতে দিয়ে যাব ?

অন্ধকার । না বাপু । চিঠি নেবার লোক এ রাজ্যে কেউ নেই । কেউ এখানে পড়তে পারে না ।

মলয়া । তবে কি আমি ফিরে যাব ?

(লাল রঙীন পোষাক পরে উষার প্রবেশ)

উষা । না বোন, তুমি ফিরে যাবে কেন ? তোমায় সাহায্য করতেই যে আমি এলাম।

অন্ধকার । (মুখ ভেংচে) ও তুমি এলে । তা তোমায় কে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে শুনি? ঝলমলে লাল টক্‌টক্ পোষাক, বিদ্যুতের মত গায়ের রং, কপালে সোনালী টিপ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে কে তুমি এলে শুনি ?

উষা । এতদিন এই বনে ঢোকবার আমি পথ খুঁজে পেতাম না —

অন্ধকার । আজও না হয়—নাই খুঁজে পেতে সে পথ। তোমায় পথ দেখালে কে শুনি ?

উষা । আমি উষা । তাই রবির আগমন বার্তা ঠিক সময় মত আমি পেয়ে গেছি । গগনের কিনারে কিনারে আমারই তো আবির ছড়িয়ে দেবার কথা ।

অন্ধকার । ও, তুমি আবির ছড়িয়ে দেবে ? আমি কিন্তু সোজা লোক নই, রাঙা উষার মেয়ে? আমি যখন রাগব, — আলকাতরা দিয়ে সব ঢেকে দেব । তখন দেখে নিও তুমি । তাই বলছি আমায় চটিও না ।

উষা । কালোকে অন্ধকারকে দূর করে দেওয়াই তো আমার কাজ ।

অন্ধকার । আরে কে রে পুঁচকে মেয়েটা ! এটা আমার রাজ্যি, আর আমাকেই কিনা দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায় । না, এই উষা মেয়েটাকে আগে তাড়াতে হবে দেখছি । এরা বসতে পারলে শুতে চায় ।

উষা । আমাকে তাড়াবে ? আমি রাঙা করে দেব তোমার এই বন ।

(উষার নাচ ও গান)

আমি রাঙা উষা জাগি পুব গগনে
শিশু রবি ওঠে তাই শুভ লগনে ।

জেনে রাখো ঃ

গগন	—	আকাশ	**বাণী**	—	সরস্বতী
উদিল	—	উঠল	**বীণা**	—	বাদ্যযন্ত্র
রবি	—	সূর্য	**অলক্ষুণে**	—	অশুভ

মলয়া — দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বয়ে আসা বায়ুকে এখানে মলয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

বারতা — বার্তা, সংবাদ খবর

পাঠ পরিচয় ঃ

অখিল নিয়োগী (স্বপন বড়ো) জন্ম - ১৯০২ সালে । বিশিষ্ট নাট্যকার ও গল্প লেখক । শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সুখ্যাত । 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার 'ছোটোদের পাততাড়ি' নামক পাতাটি বহুদিন ধরে সম্পাদনা করেছেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'গল্প সঞ্চয়ন', 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে', 'স্বপন বুড়োর শিশুনাট্য' ইত্যাদি ।

লেখক পরিচয় ঃ

ঘন গভীর বনে আলো প্রবেশ করতে পারে না, দিনের বেলাও অন্ধকার ছেয়ে থাকে । যেন অন্ধকারের রাজত্ব । একদিন হঠাৎ ভোরের পাখি উষার আলোর আভাসটুকু পেয়ে গান গেয়ে উঠল, বাতাস বইল, বহুদিনের জমে থাকা অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে ভোরের প্রথম সূর্যের কিরণ বনে প্রবেশ করলো । চারিদিকে আলো ঝল্‌মল্ করে যেন প্রকৃতিকে খুশিতে ভরিয়ে তুলল । এখানে নাট্যকার অন্ধকারকে অশুভ ও আলোকে শুভ বলে উল্লেখ করেছেন ।

মনে রেখো ঃ

এটি একটি নাটিকা । যিনি নাটক লেখেন তাঁকে নাট্যকার বলে ।

এই ছোট নাটিকাটির আড়ালে এক অন্য অর্থ লুকিয়ে আছে । আমাদের দেশ বহু বছর পরাধীন ছিল । ভারতবাসীরা যেন অন্ধকারে ডুবে ছিল । আমরা নিজেদের হীন, দুর্বল মনে করতাম । এই পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার জয় করে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করলেন । ভোরের পাখির গানের মধ্যে দিয়ে কবি অখিল নিয়োগী যেন নোবেলের বিজয় মুকুট মাথায় সরস্বতীর সাধনায় রত কবি 'রবি' কে বন্দনা করেছেন । নাটিকাটির নামকরণে যেন একই সুর ভারতের আকাশে রবির আবির্ভাব ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. ভোরের পাখির গান শুনে কে রেগে উঠল ?
2. অন্ধকারেরর পোষাকের রং কী ?
3. মলয়া কোন রং এর ওড়না পড়েছিল ?
4. মলয়া কে সাহায্য করতে কে এলো ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. ভোরের পাখি অন্ধকারকে কোন খবর শোনাল ?
6. 'এটা আমার রাজ্য' এ কথা কে বলেছে ? কাকে বলেছে ?
7. ভোরের পাখি বনে আজ কার উদয় হবে বলেছে ?
8. মলয়ার কাজ কী ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. ভোরের পাখির প্রথম গানটি নিজের ভাষায় লেখো ।
10. মলয়া নিজের কী পরিচয় দিল ? সে কেন অন্ধকারের রাজ্যে এসেছে ?
11. 'গগনে উদিল রবি' নাটিকাটি অবলম্বনে উষার বর্ণনা করো । তার কাজ কী লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. সন্ধি করো ঃ

দেশ + অন্তর =

সম্ + বাদ =

বন + অন্তর =

সু + আগত =

2. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

সুবিধা,

সোজা,

রাত,

সকাল,

আকাশ,

দেশ

3. বাক্য রচনা করো ঃ

বেরসিক,

ঝল্‌মলে

ফুরফুরে

চক্‌চকে

টক্‌টকে

ধপধপে

কুচকুচে

প্রাকৃতিক ভারসাম্য

অমরেন্দ্রনাথ গুহ

এই পৃথিবীতে প্রাণী ও তার পরিবেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে এক সুন্দর সমন্বয় । এই সমন্বয়কে আমরা বলি 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' । প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অতএব বন্যপ্রাণীর ভূমিকা অশেষ । কিন্তু এই ভূমিকা সবার অলক্ষ্যে পালিত হয়, তাই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না । সে কথা থাক। বন্যপ্রাণীকুলে পাখির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মানুষ ও পাখির মধ্যে কে আগে পৃথিবীতে এসেছে ?
2. কোন ধরনের পাখি শস্যকে কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ?
3. ভারতে আনুমানিক কত প্রজাতির কীট - পতঙ্গ আছে ?
4. ইঁদুরের বড়ো শত্রু কে ?
5. খেতের ফসল নষ্ট করতে কার জুড়ি নেই।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক জীব । পাখি এসেছে অনেক অগে, আর পাখিই অনেক ফুলের পরাগ-সংযোগ করে । ফুলকে ফলে পরিণত করতে সাহায্য করে । পাখি বট জাতীয় গাছের ফল খেয়ে নিজের জারক রসে জীর্ণ না করলে তা থেকে নতুন গাছের উদ্‌গম হয় না । নানা জাতের পাখি, নানা জাতের ফল মুখে করে এখানে - ওখানে ছড়িয়ে গাছের বংশ বিস্তার করে । এক দিকে দানাশস্যভুক্ পাখিরা যেমন ক্ষেতের শস্য খেয়ে চাষবাসের ক্ষতি করে, অন্য দিকে তেমনই পতঙ্গভুক্ পাখিরা শস্যক্ষেতের কীটপতঙ্গ খেয়ে শস্যকে অনিবার্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । বেশির ভাগ পাখিই কম-বেশি পতঙ্গভুক । পতঙ্গ প্রজাতির সংখ্যা অগণিত। একমাত্র ভারত ভূখন্ডেই প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির কীট-পতঙ্গ আছে। এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বংশবৃদ্ধি করে । পতঙ্গভুক্ পাখি যদি কীট-পতঙ্গ খেয়ে তাদের সংখ্যা না কমাত, তবে হয়তো কীট-পতঙ্গের উৎপাতে গাছপালা খাদ্যশস্য এমনকি, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হত । নিশাচর পেঁচা ইঁদুরের বড় শত্রু । এরা রাতে খুঁজে খুঁজে ইঁদুর খেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা না কমালে আমাদের অবস্থা হত

'দ্য পাইড্ পাইপার অব হ্যামলিন'-এর মতো । গঙ্গাফড়িং তার সূক্ষ্ম ছেদক অঙ্গ দিয়ে গাছের কচি পাতা কাটতে খুবই পটু । আবারএই গঙ্গাফড়িং নিজেও অনেক পতঙ্গভুক পাখির খুবই প্রিয় খাদ্য । পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোনও অঞ্চলে পতঙ্গভুক পাখির প্রজাতির সংখ্যা কমে গেলে সেখানে কীট পতঙ্গের উৎপাত ও অত্যাচার বেশ বেড়ে যায় । প্রথম দিকে হয়তো কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে এদের সংখ্যা কমানো যায়, কিন্তু পরে এই পদ্ধতিতে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব হয় না । পঙ্গপালের কথা আমরা সবাই জানি । ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে এদের জুড়ি নেই । লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল যখন আকাশ ঘন কালো করে নেমে আসে, চাষীরা তখন প্রমাদ গুনতে থাকে। সাদা সারস, ছোটো বাজপাখি এবং অন্যান্য পতঙ্গভুক পাখি কিন্তু পঙ্গপাল এবং তাদের ডিম খেয়ে তাদের সংখ্যা কমের দিকে রাখে। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে পতঙ্গভুক পাখির বংশ-বিলুপ্তির ফলে পঙ্গপালের আক্রমণ বেড়ে গেছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে এমন তিনটি পাখির নাম লেখো ।
2. পশুপাখির মরা-গলা দেহ কাদের প্রধান খাদ্য ?
3. মানিক জোড় পাখির প্রথম খাদ্য কী ?
4. প্রাণীদের পারস্পরিক কোন সম্পর্ক প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে ।

খুব বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই, আর খুব বেশি দিনের কথাও নয়,— আমরা দেখেছি, বাড়ির আশেপাশে মরা ইঁদুর বা অন্য কোনো মরা প্রাণী পড়ে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে চিল, শকুন, বাজ, শ্যেন প্রভৃতি পাখি এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করছে । কিন্তু আজ এই বর্গের পাখি প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না । কাজেই জঞ্জালমুক্ত করবার কোনো প্রকৃতিগত ব্যবস্থাই আজ আর নেই ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে পড়ে যায় । অতীতে নদী বা জলার ধারে হাড়গিলে পাখি দেখা যেত পশুপাখির মরা-গলা দেহ এদের প্রধান খাদ্য ছিল । এই প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই ধরনের জঞ্জালমুক্ত করবার কোনো স্বাভাবিক ব্যবস্থা নেই। গ্রামে নদী ও জলার ধারে লম্বা লম্বা ঠ্যাংয়ে ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাণিকজোড় পাখি,—এটা খুবই পরিচিত চিত্র ছিল এক সময় । শামুক, ব্যাং, সরীসৃপ প্রভৃতি ছিল এদের প্রথম খাদ্য । এই সব নিম্নবর্গের প্রাণী খেয়ে এরা তাদের সংখ্যা সীমিত করে রাখত ।

প্রকৃতিতে একে যেমন অপরের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই আবার জীবে জীবে দ্বন্দ্বও চলছে অহরহ। যেমন কিনা সাপ ব্যাং খায়, এবং গোখরো ইত্যাদি সাপও অন্য সাপ খেয়ে তাদের সংখ্যা কমিয়ে রাখে।

এই একতানময়তা ও বৈপরীত্যই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। পাখির ভূমিকা অপেক্ষাকৃত সহজেই বোধগম্য । কিন্তু অন্য বন্য প্রাণীর ভূমিকা ঠিক অতটা তাৎক্ষণিক নয় । প্রকৃতিতে এক জাতের প্রাণী অন্য জাতের খাদ্য । এই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ না থাকলে কোনও কোনও প্রজাতির সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেত যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হত।

তা ছাড়া অরণ্য শ্বাপদসংকুল স্থান বলেই মানুষ ভয়ে ভয়ে বনে ঢোকে । বস্তুত, এরাই প্রাকৃতিক বনরক্ষীর কাজ করে । তা না হলে মানুষ অনেক আগেই বন ধ্বংস করে ফেলত । আমাজন অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর ভয়ে দীর্ঘদিন মানুষ ভিতরে ঢুকতে পারেনি । বর্তমানে ওই অঞ্চলের বন্যপ্রাণী কমে যাওয়াতে বছরে প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল বনাঞ্চল হাসিল করা হচ্ছে । এতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেছে । আমাদের দেশের চিত্রও একই রকম । অতি দ্রুত বন্য প্রাণীর সংখ্যা কমছে, সেই হারে বনাঞ্চলও কমছে। এতে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ভূমিক্ষয়, খোয়াই বন্যা ও খরা । এখন অনেক জায়গায় কৃত্রিম বন সৃজনের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতির সদাজাগ্রত প্রহরী বন্যপ্রাণী নেই সে সব অরণ্যে । কাজেই সেই বনকে রক্ষা করতে হচ্ছে তারের বেড়া ও মানুষ প্রহরী দিয়ে, আর সেই বন হচ্ছে কোনো বিশেষ প্রজাতি নির্ভর বন । বনাঞ্চল বলতে আমরা যা বুঝি, বিভিন্ন জাতের গাছ, লতা, গুল্ম, — এ ঠিক তা নয় । কাজেই প্রকৃতির ঐকতান রক্ষায় এই বনাঞ্চল একান্তভাবেই দীন ।

লেখক পরিচয় ঃ

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশের ঢাকায় অমরেন্দ্রনাথ গুহের জন্ম । তাঁর পিতা জিতেন্দ্রনাথ গুহ এবং মাতা হিরণবালা দেবী । অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন লন্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো । কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তারূপে কর্মরত ছিলেন । বিভিন্ন পত্র — পত্রিকায় তাঁর পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় । আলোচ্য রচনাংশটি তাঁর 'প্রাণী পরিবেশ' নামক বই থেকে সংকলিত ।

জেনে রাখো ঃ

সমন্বয়	—	ঐক্য / মিল	**অশেষ**	—	যার শেষ নেই
অলক্ষ্যে	—	অগোচরে	**উপলব্ধি**	—	বুঝতে পারা
জীর্ণ	—	মলিন	**উদ্‌গম**	—	সৃষ্টি, ওঠা

অনিবার্য — যা নিবারণ করা যায় না

পতঙ্গভুক — যে পতঙ্গ খায়

অহরহ — সর্বদা

সৃজন — সৃষ্টি করা

দীন — দরিদ্র

একতানময়তা — এক সুরে বাঁধা

ভারসাম্য — বিভিন্ন দিকের সমান ভার ।

ছেদক — যা ছেদ করে

নিম্নবর্গ — নিচু শ্রেণি

বিঘ্নিত — বাধাপ্রাপ্ত

ঐকতান — মিলিত স্বর

ক্ষিপ্রতা — দ্রুততা, শীঘ্রতা

বৈপরীত্য — বিপরীতভাব

পাঠবোধ ঃ

ঠিক উত্তর বেছে লেখো ঃ

1. **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়..... ভূমিকা বিশেষ ।**

(বন্যপাখি / বন্যপ্রাণী)

2. **বেশির ভাগ পাখিই কমবেশি..... ।**

(মিস্টিভুক /পতঙ্গভুক)

3. **ভূমিক্ষয়, খোয়াই, বন্যা ও খরা দেখা দিয়েছে, তাই অনেক জায়গায় কৃত্রিম ..... সৃজনের চেষ্টা হচ্ছে ।**

(বন / নদী)

অতিসংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

4. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী কুলে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ?
5. পাখিরা কী ভাবে গাছের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে ?
6. চাষিরা কখন প্রমাদ গোনে ?
7. আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে পঙ্গপাল বেড়ে যাওয়ার কারণ কী ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

8. প্রাকৃতিক ভারসাম্য কাকে বলে ?
9. জঞ্জাল মুক্ত করার কোনো প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আজ আর নেই কেন ?
10. খাদ্য - খাদক সম্বন্ধ না থাকলে কী হতো ?
11. পাখিরা প্রকৃতিকে কী ভাবে সাহায্য করে ?
12. পঙ্গপাল কী ভাবে আমাদের ক্ষতি করে ?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও ঃ

13. বন্যপ্রাণী কীভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে ? পাঠটি পড়ে সংক্ষেপে লেখো ।
14. অরণ্য কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করে ? পাঠ অবলম্বনে লেখো ।

15. বাক্য রচনা করো ঃ

অনিবার্য	বৈপরীত্য
সীমিত	উৎপাত
কৃত্রিম	পরিচ্ছন্ন

16. পদ পরিবর্তন করো ঃ

সুন্দর	বিলুপ্ত
ফুল	অত্যাচার
বিপন্ন	জীব

17. একটি করে প্রতিশব্দ লেখো ঃ

সাপ ———————

পাখি ———————

বৃক্ষ ———————

18. বিপরীত অর্থ লেখো ঃ

কৃত্রিম	সৃজন
শত্রু	বন্যা
বোধগম্য	বিশেষ
বৃদ্ধি	সীমিত

আলোচনা করো ঃ

তোমার চেনা দুটি পাখি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় কী ভাবে সাহায্য করে তা নিয়ে আলোচনা করো । গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারো ।

বনমালীর চিকিৎসা

শিবরাম চক্রবর্তী

বনমালী ডাক্তারের নাম ডাক ভারী । নাম তার খুব, তবে নামের চেয়ে ডাক আরও বেশি। কাজের তাঁর বিরাম নেই—কেননা, ডাক্তার হলেও পরোপকার করতে তাঁর জোড়া আর ছিল না । অনেক সময়ে ভিজিট না নিয়েই তিনি রোগী দেখতেন । এমনকি, তেমন পীড়াপীড়ি করে ধরলে পীড়িতের ওষুধের দামটাও দিয়ে ফেলতেন নিজের পকেট থেকে । এমনও শোনা গেছে, দু এক অপারগক্ষেত্রে রোগীর সৎকারের ব্যয়ভারও তিনি নিজে বহন করেছেন - এমনকি, দরকার হলে তার দেহভার পর্যন্ত। রোগের আদ্যকাণ্ড থেকে রোগীর শ্রাদ্ধকাণ্ড অবধি কোনোটাই বাদ দেননি।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বনমালী কে ছিলেন ?
2. কলে যেতে হলে তিনি কি ভাবে যেতেন ?
3. তাঁর ডিস্‌পেন্সারি কোথায় ছিল ?

মোটর ওপর, কখনো কারও উপকার করার সুযোগ পেলে তার থেকে আত্মসম্বরণ করা তাঁর পক্ষে শক্তই ছিল। এই কারণে, সেই ছোট্ট মফস্বলের শহরে, পসার তাঁর বেশ জমলেও পয়সা তিনি বেশি জমাতে পারেন নি ।

এহেন বনমালী বাবু একদিন কল্ সেরে বাড়ি ফিরছেন। রোদ তখন চড়্‌চড়ে, বেলা দুপুর বয়ে

গেছে– হেঁটেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে, – কেননা বলেছি তো, পসার তাঁর খুব জমলেও পয়সা তেমন জমেনি, এই কারণেই গাড়ি ঘোড়া করা আর হয়ে ওঠে নি । হন্‌হনিয়ে চলেছেন, এমন সময়ে কে যেন কাতর স্বরে ডাক ছাড়ল – 'কেঁউ ?'

বনমালী বাবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন । একটা কুকুর । তাঁর দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ছে – কেঁউ কেঁউ ! পাশবিক আহ্বান, মানবিক ভাষার অনুবাদ করলে যার মানে হবে–'কে যায় ?'

বনমালী বাবু চলতে থাকেন । এই চড়ন্ত রোদে একটু দাঁড়িয়ে সামান্য একটা উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে । আর জবাব দেবার প্রয়োজনই বা কী ? কে যায়, দেখতে পাচ্ছে না ? যাচ্ছেন বনমালীবাবু, এই শহরের সেরা ডাক্তার । কিন্তু বলেছিই তো, কুকুররা কি আর মানুষ ! তবে আর কুকুর বলেছে কেন? কিন্তু বনমালীবাবু দু'পা না এগুতেই আবার সেই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বনমালী বাবু সকাল বেলা দরজা খুলতেই কী দেখলেন ?
2. মানুষের চিকিৎসা করার পর তিনি কার চিকিৎসা করলেন ?

এবার বনমালী বাবুর করুণার তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত হানে । একেবারে তাঁর হৃদয়ে- তাঁর এ্যানাটমির সব চেয়ে দুর্বল জায়গায়। পরোপকারের স্পৃহা জাগতে থাকে তাঁর। ফিরে আসতে হয় তাঁকে ।

বেচারী কুকুর ! একটা পা তার ভেঙে গেছে । ডাক্তার দেখতে পেয়ে তাই ডাকাডাকি সুরু করেছে। বনমালীবাবু তার কাছে গিয়ে তার পা দ্যাখেন, হাতের নাড়ি টিপে দ্যাখেন, তার পরে তার জিভ দেখবার চেষ্টা করেন ।

জিভ দেখবার জন্যে অবশ্যি বেগ পেতে হয় না । জিভ সে লালায়িত হয়ে নিজেই দেখাচ্ছিল। সবকিছু দেখেশুনে তিনি ঘাড় নাড়েন ।

কুকুরের ব্যবস্থা তিনি কী করবেন ? এ পর্যন্ত মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারের তিনি চিকিৎসা করেন নি–তাঁর সজ্ঞানে অন্ততঃ । অবশ্যি অনেক মানুষকে অজ্ঞাতে, জানোয়ার সন্দেহ না করেই, তিনি আরাম করে এনেছেন । যেমন সেবার এক পাওনা দারের বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচালেন, আর সে কিনা সেরে উঠে, ফিয়ের টাকা তো দিলই না, উল্‌টে ডিক্রিজারি করে' তাঁর বসতবাড়ি নিয়ে টানাটানি সুরু করল ! ভালো জ্বালা !

জানোয়ারের চিকিৎসা করার ঝক্‌মারি কতো ! এই সব কথাই তিনি ভাবছেন, এমন সময়ে কুকুরটা তাঁর চিন্তাধারায় বাধা দিল ।

জিজ্ঞেস করল — কেঁউ ?

ওর অর্থ, কি রকম দেখ্‌লে হে ? ইতর প্রাণীদের ভাষায় শব্দ সম্পদ বেশি নেই । মাত্র দুটি একটি কথা– কেবল উচ্চারণ আর এম্‌ফ্যাসিসের তারতম্যে মানে আলাদা আলাদা হয়ে যায় ।

"দেখলাম তো । দেখি কী করা যায় !" এই বলে' বনমালী বাবু নিজের ব্যাগ খুলে টিন্‌চার আইডিন, তুলো, ব্যাণ্ডেজ সব বার করেন । মলম দিয়ে পায়ের হাড়ে জোড় লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছেড়ে দ্যান্ বেচারাকে । আরাম হয়ে যতদূর সাধ্য লাফাতে লাফাতে সে চলে যায় । যাবার আগে জোর গলায় ধন্যবাদ জানিয়ে যায় — "ক্যাও !"— তার মানে, 'বহুৎ আচ্ছা ডাক্‌দার সাব্‌!'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শেষবারে কটি কুকুর এসেছিল ?
2. ডাক্তার বাবু আহত হলেন কেন ?
3. কুকুরে কামড়ালে কী হয় ?

বনমালী বাবু বাইরের ঘরেই রাত্রে শোন, সেই ঘরেই আবার তাঁর ডিস্‌পেনসারি । কি জানি, রাত বিরেতে যদি কোনো রোগীর ডাক আসে, এলে এক ডাকেই তাঁকে পাবে । পরের দিন ভোর হতে না হতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল । তাঁর দরজার গায়ে অদ্ভুত একটা হাঁচোড় পাঁচোড়ের আওয়াজ, কান খাড়া করে' তিনি শুনলেন ।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন । সেই কালকের কুকুরটা এবং তার সঙ্গে আর একজন — কি করে' তাঁর বাড়ি চিনে এসেছে ।

'ব্যাপার কি ?' — তাঁর মুখ থেকে কথা খস্‌তে না খস্‌তেই কালকের কুকুরটা আরেকটার দিকে নিজস্ব ভাষার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্ল, "দেখছো না ! এ বেচারারও যে একটা পা ভেঙেছে !"

ডাক্তারের চক্ষুস্থির, তাই তো বটে ।

নতুন কুকুরটাও অনুযোগ করতে থাকে — "কেঁউ কেঁউ কেঁউউ !"

অর্থাৎ আমার বন্ধুর মতো আমাকেও সারিয়ে দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ ওষুধপত্র সাজসরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বনমালী ডাক্তার। আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন এই ভেবে যে তাঁরই দয়ায় তাঁর হতভাগ্য জীবদের উদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার-সাধনের সুযোগ তিনি পেয়েছেন — সুযোগ এবং শক্তি। অল্পক্ষণেই আরাম হয়ে দুই বন্ধু পুলকিত পায়ে চলে গেল। যাবার সময়ে ডাক্তার বাবুকে ল্যাজ তুলে নমস্কার জানিয়ে যেতে দ্বিধা করল না।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই দুটো কুকুর — তারা তখন বেশ পদস্থ লোক— এবং তাদের সঙ্গে আরো দুজন। নবাগতরা খোঁড়া। নতুন রোগীদের সারিয়ে ছেড়ে দিয়ে বনমালী ডাক্তার বিস্ময়ের আতিশয্যে ভেঙে পড়লেন। এতদিন তিনি মানুষের মহলেই বিখ্যাত ছিলেন, এখন কি ইতর প্রাণীদের সমাজেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো ? ভাবতে ভাবতে বেশ গর্ব হোলো তাঁর মনে।

তারপর দিন আটটা কুকুরের আবির্ভাব ! ঐ একই রকমের হাত পা ভাঙা। তাদের পুনর্নির্মাণ করতেই ডাক্তারের সারা সকালটা কেটে গেল— মানুষের কলে তাঁর আর বেরুনো হোলো না সেদিন।

না হোক্, তাতে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। মানুষকে ভালো করে যত না আনন্দ তিনি জীবনে পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ পাচ্ছেন এই ক'দিন ধরে— এই অমানুষদের আরাম করে'। তাছাড়া, একটা বিষয়ে মানুষের সঙ্গে আশ্চর্য এদের মিল তিনি দেখেছেন। একটাও কেউ ভিজিট দেয় না, দিতেই চায় না, দেবার কোনো মৎলবই নেই। এক হিসেবে সেটা ভালোই বলতে হবে, অচল টাকা পকেটস্থ হবার বালাই নেই।

পরদিন দরজা খুলতেই তাঁর চোখে পড়লো ষোলোটা কুকুর। সবাই তাঁর চিকিৎসার জন্য সমান লালায়িত। সেদিন চারপেয়ে রোগীদের ব্যবস্থা করতেই বিকেল গড়িয়ে গেল, সময়মত তাঁর স্নানাহার পর্যন্ত হোলো না। তারপরের দিন বত্রিশটা।... যারা সারতব্য, তাদের সঙ্গে, যারা সেরে গেছে তারাও এসে দেখা দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এসেছে মনে হয়। সারা ডিস্‌পেন্‌সারিতে তিল ধারণের স্থান নেই। সেদিন দু'জন কম্পাউণ্ডার ভাড়া করে' এনে তাঁকে কাজ সারতে হোলো।

পরের দিন কুকুরে কুকুরে একেবারে ছয়লাপ ! তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি শুনে সারা জেলায় যেখানে যে কুকুর ছিল সবাই এসে হাজির। সাম্‌নের রাস্তা কুকুরে আর কুকুরে ভর্তি ! 'এত কুকুর ছিল কোন্ রাজ্যে !' চোখ কপালে তুলে বনমালী ডাক্তার চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

কুকুরদের চেঁচামেচির অন্ত নেই । সবাই আগে দেখাতে চায়, সারতে চায় সবার আগে । সরতে চায় না কেউই ।

সব জিনিসেরই সীমা আছে । এমন কি, বনমালীরও । বনমালী ডাক্তারের আজ অসহ্য বোধ হয়। কুকুরদের কাতর প্রার্থনায় তাঁর মাথা গরম হতে থাকে । মানুষ রোগী দেখবার তাঁর ফুরসৎ নেই, নাওয়া খাওয়া তো মাথায় উঠেছে, দিনরাত কেবল কুকুর আর কুকুর ! ধুত্তোর ! কুকুরের নিকুচি করেছে ।

"নিয়ে আয় তো আমার বন্দুক । ভালো করে' ব্যাটাদের সারাই !" ক্ষেপে গিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন । উঠে নিজেই নিয়ে এলেন বন্দুকটা । "আজ এই দিয়েই শেষ করবো ব্যাটাদের । তবেই আমার নাম বনমালী ডাক্তার ।"

কিন্তু শেষ করা দূরে থাক, শুরু করার আগেই একটা কুকুরের ল্যাজে তাঁর পা পড়ে গেল । পড়তেই সে খ্যাঁক্ করে' তার পায়ে কামড়ে দিল । তিনি চেয়ে দেখলেন – তার সব প্রথমকার সেই রোগী, – তারই এক কাজ ! এই কাণ্ড দেখে তারপর আর তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকলো না । বন্দুক হাতে তাঁর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হোলো । বন্দুক ছোড়ার কথা তিনি ভুলেই গেলেন, বন্দুককে ছড়ি বলে' তিনি জ্ঞান করলেন। রোগীদের একদিক থেকে বন্দুক পেটা সুরু করলেন । এপর্যন্ত যতগুগুলো কুকুরের খোঁড়ামি তিনি দূর করেছিলেন তার দেড়গুণ কুকুরকে ন্যাড়া করে তবে তিনি ঠাণ্ডা হলেন ।

কিন্তু ক্রমশঃ তাঁকে আরো বেশি ঠাণ্ডা হতে হোলো । ওর একমাস পরের ঘটনা ।

বনমালী ডাক্তার নিজেই এখন হাসপাতালে আছেন । কুকুরের কামড়ের ফলে ভয়াবহ জলাতঙ্ক রোগ তাঁকে ধরেছে, বাঁচবার কোনো ভরসা নেই ।

শেষ মুহূর্ত ঘনীভূত হবার আগে নার্সকে তিনি ইঙ্গিতে ডাকলেন,

"আমার একটা কথা রাখবে ?"

নার্স ব্যস্ত হয়ে উঠলো, "ডাক্তার সাহেবকে ডাকব ?"

"না না, তার কোনো দরকার নেই । একটা কথা রাখতে বলছি তোমায় । ঈশপের গল্প পড়েছ?"

নার্স ঘাড় নাড়ে, – "পড়েছি বই কি ।"

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, সেই গল্পটা ?"

"পড়েছি ডাক্তার ।"

"আমার গল্পটাও যেন সেই বইয়ে যোগ করে দেয়া হয় । একদা এক কুকুরের পা ভাঙিয়াছিল। বাঘের গলার হাড় তোলা সেই বকের চেয়ে আমার পরিণাম কিছু কম শোচনীয় নয় । বক তবু মাথা বাঁচাতে পেরেছিল, আমি তাও পারলাম না । কেমন ? যোগ করতে বলবে তো ?"

"কোন্ ঈশপকে ?" একেবারে বাক্যহীন হবার আগে বনমালী আরেকবার অবাক্ হলেন । — "কাকে আবার ? সেই-ই তো তার বইয়ে এটাও যোগ করবে ।"

"ঈশপ ? তিনি তো মারা গেছেন ।" নার্স তাঁকে জানায় ।

"মারা গেছেন ?...কবে ?...কেন ?... তাঁকেও কি কুকুরে কাম্‌ড়ে ছিল নাকি ?"

ঈশপের মৃত্যুশোক বনমালীর সহ্য হোলো না । দেখতে দেখতে তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেল। সেই ধাক্কাতেই তিনি হার্টফেল করলেন । এমন কি, মরবার আগে ঘেউ ঘেউ করতেও তিনি ভুলে গেলেন।

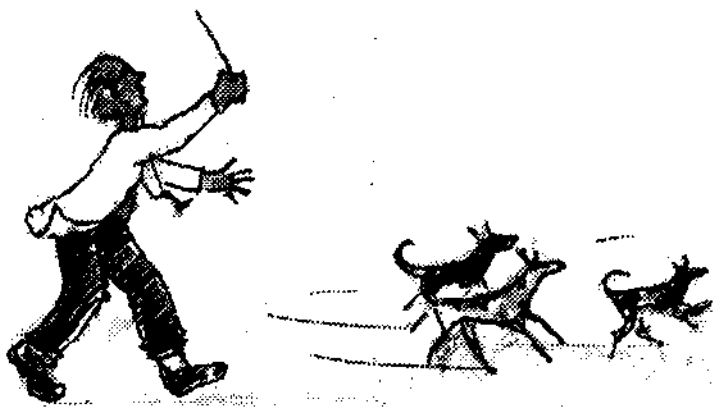

জেনে রাখো ঃ

ব্যয়ভার — খরচের ভার

পাশবিক — পশুর মত

প্রয়োজন — দরকার

অজান্তে — না জেনে

এম্‌ফ্যাসিস — জোর দেওয়া

ইতর — অভদ্র

পাঠবোধ ঃ

সঠিক ভাবে দাগ দিয়ে মেলাও ঃ

1. স্তম্ভ 'ক' য়ের সঙ্গে স্তম্ভ 'ম' কে সঠিকভাবে দাগ দিয়ে মেলাও ঃ

ক	ম
পীড়া	ক্ষণস্থায়ী
আহ্বান	মানুষের
মানবিক	সকালে
প্রাতঃকালে	ডাক
অল্পক্ষণ	দুঃখ, অসুখ

2. বাক্য তৈরি করো ঃ

বিরাম, ব্যয়, দুপুর, সজ্ঞান, আকর্ষণ, খ্যাতি, উদ্ধার ।

সংক্ষেপে লেখো ঃ

(1) ডাক্তার বাবু বেশি পয়সা জমাতে পারেননি কেন ?

(2) প্রয়োজন পড়লে ডাক্তার বাবু রোগীর কী বহন করতেন ?

(3) ডাক্তার বাবু কুকুরের চিকিৎসা কেন শুরু করলেন ?

(4) বনমালীবাবু ডাক্তার হিসাবে কিরকম স্বভাবের লোক ছিলেন ?

(5) উপকার করার সুযোগ পেলে তিনি কী করতেন ?

(6) কুকুর ডাক্তারবাবুকে কেন কামড়াল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

(7) কোন্ ঘটনা বনমালী ডাক্তারকে কুকুরের ডাক্তার করে তুলল ঘটনাটি বর্ণনা করো ।

(৪) বনমালীবাবু কুকুরদের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাদের শাস্তির জন্য কী উপায় অবলম্বন করলেন?

(9) কুকুরে কামড়ালে কী রোগ হয়, ডাক্তার বাবুর মৃত্যু কিভাবে হল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. সন্ধি করো ঃ

পর	+	উপকার	জল	+	আতঙ্ক
নিঃ	+	রোগ	পুনঃ	+	উদ্ধার
মনঃ	+	যোগ	দুঃ	+	অবস্থা

2. এক কথায় প্রকাশ করো ঃ

জানবার ইচ্ছা	মনুর পুত্র
জনকের কন্যা	দয়া আছে যার

3. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

তোমার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো পশু-পাখিদের প্রতি তুমি কেমন আচরণ করবে ? এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ।

জেনে রাখো ঃ

বিভক্তি — যে চিহ্ন দ্বারা সংখ্যা, পুরুষ ও কারক জানা যায়, তাকে বিভক্তি বলে ।

বিভক্তি দুই প্রকার — (১) শব্দ বিভক্তি (২) ক্রিয়া বিভক্তি

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, এই সাতটি **শব্দ বিভক্তি** ।

এর দ্বারা কারক ও সংখ্যা বোঝা যায় ।

ক্রিয়া বিভক্তি যেমন — করছি, করছো, করছে । এখানে 'কর্' ক্রিয়া পদের সঙ্গে — ছি, - ছো, — ছে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন হয়েছে ।

চির তুষারের দেশ

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

ছাব্বিশে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সাল । ফিন পোলারিস (জাহাজ) দাঁড়িয়ে রয়েছে অনন্ত শুভ্রতার সামনে । যেদিকে দুচোখ যায় কেবল বরফের সমুদ্র মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশে ঝক্‌ঝকে সূর্য । রঙিন চশমা পরা সত্ত্বেও চোখ ঝলসে দিচ্ছে চারিদিকের উজ্জ্বল রুপোলি আলোর ছটা। পৃথিবীর তলায় লুকিয়ে থাকা শেষ আবিষ্কৃত মহাদেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, এটা পৃথিবীরই কোনো জায়গা এতটা বিশাল ব্যাপ্তি আর সর্বব্যাপী নৈঃশব্দ্য যেন একটা অপার্থিব অনুভূতি এনে দেয়। মনে হল কোনো রূপকথার রাজ্যের ঘুমন্ত পুরীতে এসে পড়েছি। দূরে বরফের টুকরোর ওপর শুয়ে থাকা একটি সীল বা একদল পেঙ্গুইন এই রূপকথার রাজ্যের প্রাণ। আমাদের জাহাজ এ রাজ্যে বেমানান ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লেখিকা যে জাহাজে আন্টার্কটিকোস গিয়েছিলেন, তার নাম কী ?
2. এই রূপকথার রাজ্যের প্রাণ কারা ?

প্রাচীন গ্রিকরা এক কল্পিত দক্ষিণ দেশের নাম দিয়েছিল 'আন্টার্কটিকোস'—মানে সপ্তর্ষির বিপরীতে। আন্টার্কাটিকোস (Antartikos) শব্দের মানে Opposite the Bear (Ant=Opposite, artik=Bear) হচ্ছে উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ যাকে আমরা বাংলায় বলি সপ্তর্ষিমন্ডল যেহেতু দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে সপ্তর্ষিমন্ডল দেখা যাবে না, তাই এই নামকরণ । সত্যি, সব চেনাজানা জিনিসের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে এই দেশটা ।

হিমালয়ের বিশাল মহিমামন্ডিত তুষারধবল রূপ দেখেছি, আল্পস্ আর রকির রাজকীয় চোখঝলসানো সৌন্দর্যও দেখা, দেখেছি— উত্তর মেরুবৃত্তের বরফ-ঢাকা ঢেউখেলানো তুন্দ্রা, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের অতল গহ্বর কিংবা ভারত আটলান্টিক মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি । কিন্তু এই শুভ্র তুষারভূমির বৈচিত্র্যহীন

সরল রূপ একেবারে অকল্পনীয় ছিল । আমার দেখা কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গেই এ রূপের মিল নেই । প্রকৃতি কেবল দুটি রং ব্যবহার করেছে এখানে, আর অতি সরল কয়েকটি রেখা, কিন্তু তাতেই কী বিচিত্র সুন্দর রূপ প্রকাশ পেয়েছে । অন্তহীন বরফের রাজ্যে সাদা রঙেরও কত রকমভেদ, কোথাও সূর্যের আলো লেগে রুপোগুলোর রং গলে পড়ছে । কোথাও জলরঙের মতো স্বচ্ছ ফিকে নীলাভ দ্যুতি, কোথাও একটু ফিরোজের আভা ছোঁয়ানো, আবার কোথাও বা হালকা ছাই-এর প্রলেপ, কিংবা কচি আপেলের সবুজ । জাহাজের পাল উলটে যাওয়া বরফের গায়ে কখনও হালকা হলুদের আলপনা। এখানে ওখানে বরফের সমুদ্র থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে — নানা আকৃতির হিমশৈলগুলি — নিঃশব্দ মগ্ন মৈনাক ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'নিঃশব্দ মগ্ন মৈনাক' কাকে বলা হয়েছে ?
2. জমাট বাঁধা শুভ্র তুষার খণ্ড থেকে কী বেরিয়ে আসতে পারে ?
3. কোন্ জায়গাকে অজানা গ্রহ বলা হয়েছে ?

এই নিশ্চল, নিস্তব্ধ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কে বলবে যে কী প্রচন্ড শক্তি সুপ্ত রয়েছে এই দিগন্তব্যাপী শুভ্রতার মধ্যে । যে কোনো মুহূর্তে এই জমাট বাঁধা নিঃশব্দ চূর্ণবিচূর্ণ করে গগনভেদী নিনাদে মূল তুষারখন্ড থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে দৈত্যাকার হিমশৈল। তুষারঝড়ের বাসভূমি এই আন্টার্কটিকায় এক নিমেষেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে প্রবল ঝোড়ো বাতাস । চারপাশের বরফজমা সমুদ্র স্রোতের ইঙ্গিতে ভয়াল হয়ে উঠতে পারে দেখতে দেখতে—পিষে ফেলতে পারে চারপাশের সবটুকু আলো । পায়ের নিচে এই বিশাল সাদা চাদরটার তলায় কে বলবে লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর জলরাশি— চরম প্রতিকূল কঠিন পরিবেশে অভ্যস্ত অসংখ্য ছোটো-বড়ো নানান প্রাণী । এই আপাত নিস্তব্ধতার পেছনেই হয়তো চলছে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম—শিকারী লেপার্ড, সীল আর শিকার পেঙ্গুইনদের মধ্যে ।

আমাদের পৃথিবীর তলায় লুকিয়ে থাকা এই মহাদেশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর বাইরে কোনো অচেনা-অজানা গ্রহে এসে পড়েছি । আমার চেনা কোনো পরিবেশ বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ পটভূমির তুলনা হয় না । এই রূপকথার রাজ্যে যেন আমাদের অনধিকার প্রবেশ । প্রচন্ড শব্দ করে আমাদের জাহাজ বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছে জমাট সমুদ্রের ওপর, বরফের পাথর কেটে পথ বার করার আশায় । আমরা ক'জন ডেকের ওপর প্রায় নিঃশব্দে সম্মোহিত হয়ে দেখছি অন্তহীন শুভ্রতাকে। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম জীবনে অবাস্তব কল্পনাও কখনো সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ।

জেনে রাখো ঃ

অনন্ত — অন্তহীন, যার শেষ নেই। **অপার্থিব** — অলৌকিক

গহ্বর — গর্ত **মৈনাক** — একটি পৌরাণিক পর্বত।

হিমশৈল — বরফের পাহাড়, হিমালয়। **সম্মোহিত** — মুগ্ধ

নৈঃশব্দ — নীরবতা **তুষারধবল** — বরফের মতো সাদা

দ্যুতি — ছটা **নিনাদ** — শব্দ, গর্জন

ভয়াল — ভয়ঙ্কর

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. **মনে হল কোনো রূপকথার রাজ্যের ..... এসে পড়েছি।**

(ঘুমন্ত পুরীতে, রাজপুরীতে)

2. **..... উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ।**

(Bear, Dear)

3. **প্রকৃতি কেবল.....রঙ ব্যবহার করেছে দক্ষিণের এই মহাদেশ, আন্টার্কটিকোস'— এ।**

(দুটি, তিনটি)

4. **জাহাজের পাশে উল্টে যাওয়া বরফের গায়ে হালকা হলুদের.....।**

(আলপনা, আঁকিবুকি)

5. **আন্টার্কটিকা..... বাসভূমি।**

(তুষারঝড়ের, বালুর ঝড়ের)

সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. প্রকৃতি শুভ্র তুষারভূমির সৌন্দর্যের জন্য কী কী ব্যবহার করেছে ?
7. বরফের সাদারঙের মধ্যেও কি কি রঙের বাহার দেখা যায় ?
8. এই পরিবেশে কী কী প্রাণী দেখা যায় ?
9. এই রূপকথার রাজ্যে বেমানান কী ?
10. 'আন্টার্কটিকোস' শব্দের মানে কী ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

11. লেখিকা আন্টার্কটিকার অনন্য রূপের কথা বলতে গিয়ে অন্য যে সমস্ত অঞ্চলের রূপবৈচিত্র্যের কথা বলেছেন, তা লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. সন্ধি করো ঃ

সপ্ত + ঋষি	দৈত্য + আকার	দিক্ + অন্ত
হিম + আলয়	বৃষ + তি	নিঃ + চল

2. এক কথায় প্রকাশ করো ঃ

যা জানা যায় না	খেলায় পটু যে
যা চেনা যায় না	যার অন্ত নেই

3. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

টি. ভি. তে বরফের দেশ আন্টার্কটিকোস দেখে তোমার কেমন লেগেছে তার বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

বদ্যিনাথের বড়ি

লীলা মজুমদার

কোন সকালে কলু কদ্দিন দেখেছে রাস্তার মধ্যিখানে লোহার গোল ঢাকনি খুলে খ্যাংরাকাঠির মতন গোঁফওয়ালা লোক, ছোট বালতি হাতে দড়িবাঁধা কালো ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ওৎ পেতে বসে থাকে । লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কাদার ছিটে— অমুদা যখন দাড়ি কামাতো না তখন তাকে যেমন দেখাতো সেই রকম দেখায় । ছোট ছেলেটা হয়তো ওর ভাইপো হবেও বা। ওর নাম হয়তো ছক্কু, ওর গায়ে মোটে কাপড় নেই, কিন্তু কানে সোনালি রংয়ের মাকড়ি, গলায় মাদুলি বাঁধা। বুবু বলে নাকি সত্যি সোনার নয়; ওরা গরিব কিনা, খেতেই পায় না, ও পেতলের হবে । কলু আর বুবু ছাড়া ওদের কেউ দেখেই না । সামনে দিয়ে দেবরঞ্জন মামা, অমুদা, ননিগোপালরা সবাই চলে যায়, তাড়াতাড়ি কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ি — ওদের চোখেই পড়ে না । কিন্তু কলু দেখেছে লোকটা মাঝে মাঝে বালতি টেনেটুনে উপরে তোলে, সেটা থাকে কাদায় ভরা; সেই নোংরা কাদা রাস্তার পরিস্কার ডাষ্টবিনে ঢেলে আবার বালতি নামিয়ে দেয় । কাদা ছাড়া কখনও কিচ্ছু ওঠে না । কত কি তো হারিয়ে যায়, কিন্তু ওর ভিতর থেকে কিছু কক্ষনোও বেরোয় না

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাত্রে বুবু আর কলুকে কে পড়াতে আসেন ?
2. কলু কেমন চেয়ারে বসতো ?
3. মাস্টার মশাইয়ের ছেলের নাম কী ?

। দাদা বলেছিলো বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে ওর সোজাসুজি যোগ আছে, ওর ভিতর কুঁদো কুমির ছেলেপুলে নিয়ে হুমো দিয়ে থাকে, কই বালতিতে তার ডিমটিম তো কক্ষনও পাওয়া যায় না !

দাদার ফাউন্টেন পেন হারিয়ে গেলো; চিনুদার কবিতার খাতা হারিয়ে গেলো; বদ্যিনাথের নতুন

চটি হারিয়ে গেলো গোরা—মামার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে; সেইদিনই আবার পাল সাহেবের ছাতাও কোথায় হারিয়ে গেলো; ছোড়দির চুড়ি ড্রেনের ভিতর তলিয়ে গেলো; এতো সব গেলো কোথায় ? তার কিচ্ছু মোটে কোথাও পাওয়াই গেলো না । অথচ সেই লোক দুটো কতো কাদা ওঠালো ! রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন, বুবু পড়ে না, কলু পড়ে ।

—রোজ রাত্রে, রবিবার ছাড়া কলু কত সময়ে সেই দু'জনের কথা ভাবে, সন্ধি—সমাস গোল হয়ে যায়, মাস্টারমশাই রেগে কাঁই ! বলেন, "ওরে আহাম্মুক ! আমার ছেলে বিধুশেখর তোর অর্ধেক বয়েসে তোর তিন গুণ পড়া শিখতো !" ছেলে বটে ঐ বিধুশেখর ! তার কথা শুনে শুনে কলু তো হেদিয়ে গেলো।

সে কখনও হাই তুলতো না, কক্ষনও চেয়ারে মচমচ শব্দ করতো না, কক্ষনও চটি নাচাতো না। প্রথম প্রথম কলু ভাবতো, তা হলে সে বোধ হয় এতো দিনে নিশ্চয় মরে গিয়েছে। কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন সে নাকি বিয়ে করে কোথায় পোস্টমাস্টারি করে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বদ্যিনাথের বড়ির রঙ কেমন ছিল ?
2. বদ্যিনাথের বড়ি কী দিয়ে তৈরি ?
3. মাস্টারমশাই কলুকে চুপি চুপি কী সেজে আসতে বলেন ?

একদিন বদ্যিনাথ কতকগুলো সাদা বড়ি এনেছিলো। বলেছিলো, ওগুলো নাকি ছানা বাঁদরের রস দিয়ে তৈরি, কোন কবিরাজের কাছ থেকে এনেছে। নাকি অনেক দিন আগে মানুষদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিলো, সেই বাঁদুরে রক্ত মানুষের গায়ে আছেই আছে, ঐ আশ্চর্য বড়ি খেলে তাদের আবার বাঁদর হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—ঐ এক রকম ধাত কিনা ! কলু তার দুটো বড়ি চেয়ে রাখলো, কাজে লাগতে পারে।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বহুদূরে, উনি তবু রোজ ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতেন। কি শখ বাবা পড়াবার! মাঝে মাঝে দাদারা এসে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়তো, কলুকে শব্দ রূপ মুখস্থ করতো হতো। কলুর চোখ বুজে আসতো, মাথা ঝিমঝিম করতো, আর দাদারা শুধু কথাই বলতো। কলু দড়িবাঁধা ছেলেটার কথা ভাবতো, আর শুনতে পেতো পাশের বাড়ির ছোট ছেলেরা খেতে বসে হল্লা করছে। আর ভাবতো, এমন অবস্থায় পড়লে মাস্টারমশাইয়ের ছেলে সেই বিধুশেখর কি করতো !

এক এক দিন যেই পড়া শেষ হয়ে আসতো, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতো। মাস্টারমশাই হয়তো বাড়িতে ছাতা ফেলে আসতেন, আটকা পড়তেন। কলু ব্যস্তভাবে বলতো, "ছাতা এনে দিই, ভালো ছাতা?" মাস্টারমশায় বলতেন, "না না, থাক। একটু বসে যাই।" কলু আবার সেই মচমচে চেয়ারটাতে বসতো। মাস্টারমশাই তাঁর ছোটবেলাকার অনেক গল্প বলতেন। তখন বাবাও নাকি ছোট ছিলেন, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন, পুজোর সময় কাদের বাড়ি যাত্রা গান হতো, পালিয়ে গিয়ে শুনতেন। কলুর চোখ জড়িয়ে আসতো, হাই তুলতে সাহস হতো না; ভাবতো এতক্ষণে সেই দড়িবাঁধাটা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। হাইগুলো মাথায় গিয়ে জমাট বাঁধতো, চম্‌কে জেগে যেতো, শুনতো মাস্টারমশাই বলছেন, "দে বাবা, ছাতাই দে। এ আর আজ থামবে না।" কলু ছুটে ছাতা এনে দিতো, মাস্টারমশাই চলে যেতেন আর কলুর ঘুমও ছুটে যেতো। এমনি করে দিন যায়। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, মাস্টারমশাই বিধুশেখরের কথা বলছেন। সে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে কখনও বায়োস্কোপ দেখেনি,

থিয়েটারে যায়নি, বিড়ি টানেনি, গল্পের বই খোলেনি। বলতে বলতে মাস্টারমশাই বললেন, "ওরে, চুপিচুপি দুটো পান সেজে নিয়ে আয় তো দেখি।" কলু দৌড়ে গেলো, পান দিলো, চুন দিলো, দুটো করে এলাচ-দানা দিলো, বড় বড় সুপুরির কুচি দিলো, আর সব শেষে কি মনে করে বদ্যিনাথের সেই আশ্চর্য বড়িও একটা করে গুঁজে দিলো। মাস্টারমশাই একটা পান তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন, একটা বইয়ের মতন দেখতে টিনের কৌটোতে ভরলেন। কলু তাক করে রইলো। প্রথমটা কিছু মনে হলো না—তারপর ভালো করে দেখলো, মনে হল মাস্টারমশাইয়ের কপালের দিকটা কি রকম যেন লম্বাটে দেখাচ্ছে, থুতনিটা যেন ঢুকে পড়ছে, চোখ দুটোও কি রকম পিট্‌পিট্ করতে লাগলো। কলুর বুকের ভিতর কেমন টিপ্‌টিপ্ করতে লাগলো। মাস্টারমশাই বাড়ি যান না কেন ? যদি হঠাৎ ল্যাজ দুলিয়ে হুপ করেন ? এমন সময়ে বৃষ্টি থেমে গেলো, মাস্টারমশাই

ধুতির খুঁটটা কাদা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে গেলেন। কলু ভাবতে লাগলো, কদিন আর ধুতির খুঁট ? অন্য পানটা বিধুশেখর বোধ হয় আজ রাত্রে চেয়ে নেবে, তারপর সেই বা ধুতি নিয়ে করবে কি !

পরদিন বিকেলে বই নিয়ে কলু অনেকক্ষণ বসে রইলো, কিন্তু মাস্টারমশাই এলেন না। সন্ধ্যাবেলা বাবা বললেন, "ওরে তোর মাস্টারমশাই যে হেডমাস্টার হয়ে বিষ্টুপুর চলে গেলেন।" কলু ভাবলো, বিষ্টুপুর কেন, কিষ্কন্ধে হলেও বুঝতাম ! তারপর বহুদিন চলে গেছে। কলুর নতুন মাস্টার এসেছেন,তাঁর ছেলের নাম বিধুশেখর নয়, তাঁর ছেলেই নেই। তিনি কলুকে রোজ ফুটবলের, ক্রিকেটের গল্প বলেন—কিন্তু কলুর থেকে থেকে মনে হয়, অন্ধকারে ও বাড়ির পাঁচিলে দুটো কি ল্যাজঝোলা

বসে আছে ! একটার মুখ কেমন চেনাচেনা, অন্যটা বোধ হয় বিধুশেখর !

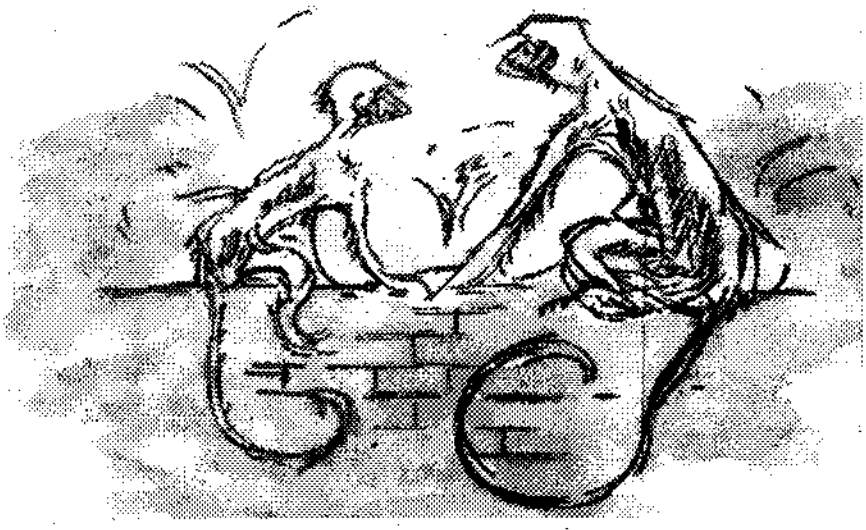

লেখক পরিচয় ঃ

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম । 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক । বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম । 'আর কোনোখানে' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কার পান । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'হল্‌দে পাখির পালক', 'পদিপিসির বর্মী বাক্স', 'বাতাসবাড়ি' প্রভৃতি ।

জেনে রাখো ঃ

খ্যাংরাকাঠি — ঝাঁটার কাঠি **আহাম্মুখ** — মুর্খ

হল্লা — চিৎকার, চেঁচামেচি **মাকড়ি** — কানে পরার দুল

ডাস্টবিন — নোংরা জিনিস ফেলার জায়গা **সম্ভাবনা** — হতে পারে বা ঘটতে পারে

পাঠবোধ

ঠিক উত্তর বেছে খালি জায়গাগুলি ভরো ঃ

1. দাদার ফাউন্টেন..... **হারিয়ে গেলো** ।

(পেনসিল / পেন)

2. চিনুদার কবিতার ..... হারিয়ে গেলো ।

(বই / খাতা)

3. বদ্যিনাথের নতুন ..... হারিয়ে গেলো ।

(জামা / চটি)

4. একদিন ..... কতকগুলো সাদা বড়ি এনেছিল ।

(মাস্টারমশাই / বদ্যিনাথ)

5. তোর মাস্টারমশাই যে ..... হয়ে বিষ্টুপুর চলে গেলেন ।

(বদলি / হেডমাস্টার)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

6. মাস্টারমশাই পড়াতে বসে কেন রেগে যান ?
7. কলু দুটো বড়ি চেয়ে রাখলো কেন ?
8. মাস্টারমশাইয়ের কাছে কলু পড়তে বসে কী কী ভাবতো ?
9. পরদিন কলুর মাস্টারমশাই এলেন না কেন ?
10. কলুর নতুন মাস্টারমশাই কেমন ছিলেন লেখো ।

বিস্তারিত ভাবে উত্তর দাও ঃ

11. কলুর মাস্টারমশাই পড়াতে এসে নিজের ছেলের সম্পর্কে কী কী প্রশংসা করতেন আর তার প্রশংসা শুনতে কলুর কেমন লাগতো ?
12. বদ্যিনাথের বড়ি কী দিয়ে তৈরি ? খেলে কী ঘটতে পারে ?
13. বদ্যিনাথের বড়ি খেয়ে মাস্টার মশাইয়ের শরীরে কী পরিবর্তন দেখা গেলো বলে কলুর মনে হোল তা লেখো ।

বাক্য বানাও ঃ

17. টেনেটুনে, সোজাসুজি, ছেলেপুলে,

মচ্‌মচ্‌, ঝিম্‌ঝিম্‌, হুন্ডলুড়

18. পদপরিবর্তন করো ঃ

রস, কবিরাজ,

বাঁদর মুখ,

লোক, নতুন ।

19. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

মামা ছোড়দি

দাদা মাস্টারমশাই

ভাইপো পুরুষ

20. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

বাঁধা নোংরা

সামনে নতুন

সত্যি অর্ধেক

তাড়াতাড়ি দুর

আলোচনা করো ঃ

এ রকম আর কোনো মজার গল্প কেউ জানলে সেই গল্প ক্লাসের অন্যদের শোনাও। গল্পের শেষে কেউ প্রশ্ন করো কেউ উত্তর দাও ।

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী

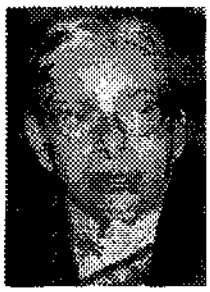

মহাশ্বেতা দেবী

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনে বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার বিদ্রোহ—সর্বাপেক্ষা ভীষণ ও সফলকাম হয়েছিল। সহস্র দেশবাসী, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-অজ্ঞ, নারী-পুরুষ সকলেই বিদ্রোহী রূপে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন পুরুষদের সাহায্যকারিণী রূপে। এই সকল বীর রমণীদের কথা স্মরণ করলেই সর্বাগ্রে মনে আসে বৃদ্ধা মাতাঙ্গিনী হাজরার কথা। বার্ধক্যজনিত দৈহিক অক্ষমতা ও জড়তা উপেক্ষা করে এই মহীয়সী নারী দেশের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মাতৃভূমিকে তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জানিয়ে দিলেন ভারতবাসীর আন্তরিক স্বাধীনতা কামনা।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কত খ্রিস্টাব্দে আগস্ট আন্দোলন হয় ?
2. আগস্ট আন্দোলনে বিদ্রোহীর রূপে কারা যোগ দিয়েছিলেন ?
3. বীর রমণীদের মধ্যে কার নাম সবচেয়ে আগে স্মরণ করা হয় ?
4. মাতঙ্গিনী হাজরা কোন জেলার নিবাসী ছিলেন ?
5. ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য দেশবাসী কী করতে চেয়েছিলেন ?

ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশবাসী তখন ধৈর্যহারা । তারা ঠিক করল সমস্ত থানা, সরকারী দপ্তরখানা জয় করে দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । সে এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম—দলে দলে নিরস্ত্র ও অহিংস শোভাযাত্রী চলেছে তাদের অভীষ্ট সাধন করতে আর তাদের বাধা দিচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যদল । সেই সকল সশস্ত্র সৈন্য প্রচন্ডভাবে চালাচ্ছে লাঠি, কখনও বা চালাচ্ছে গুলি । নিরস্ত্র জনতা মাঝে মাঝে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে বা নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অন্যদিকে এগিয়ে চলেছে । শত সহস্র সত্যাগ্রহী প্রাণ হারাল, আহত হল অনেকে। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ৭৩ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা পরিচালনা করেছিলেন এক শোভাযাত্রা, যেটি এসেছিল তমলুক মহকুমার উত্তর দিক থেকে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন জাতীয় পতাকা হাতে নির্ভীক রমণী মাতঙ্গিনী । এই নির্ভীক রমণী ভুলে গেছেন বয়সের ভার, ভুলে গেছেন ব্রিটিশ সরকারের বিপুল সশস্ত্র সেনাবাহিনী ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মাতঙ্গিনী হাজরার হাত দুটো কখন অবশ হোল ?
2. তাঁর কণ্ঠস্বর কখন নীরব হোল ?
3. বৃদ্ধা দেশ সেবিকার রক্তে কোথাকার মাটি পবিত্র হোল ?

শোভাযাত্রা প্রবেশ করল শহরে । ব্রিটিশ সেনা বাধা দিল প্রচন্ডভাবে অভিযান কারীদের । শোভাযাত্রা হল ছত্রভঙ্গ। ক্ষণিকের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকগণকে একত্রিত করে মাতঙ্গিনী অদম্য উৎসাহে সরকারী সৈন্যদের সম্মুখীন হলেন । ব্রিটিশ সৈন্যদল শুরু করল গুলিবর্ষণ।

সৈন্যরা তাঁর দু হাতই গুলিবিদ্ধ করল । হাত দুটো হয়ে গেল অবশ । শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাতীয় পতাকা উঁচু করে ধীরে ধীরে সরকারী ভারতীয় সৈন্যদের বললেন, 'ভাই সব, বিদেশী অত্যাচারী শাসকদের দাসত্ব ত্যাগ করে চলে এস আমাদের দুঃখিনী জন্মভূমিকে মুক্ত করতে ।' এমন সময় একটি গুলি এসে লাগল তাঁর কপালে, কণ্ঠস্বর হল নীরব—লুটিয়ে পড়লেন মাতঙ্গিনী মাটিতে । বৃদ্ধা দেশসেবিকার রক্তে পবিত্র হল তমলুকের মাটি ।

জেনে রাখো ঃ

রমণী	—	নারী	**কামনা**	—	ইচ্ছা
ব্রিটিশ	—	ইংরেজ	**সম্মুখীন**	—	মুখোমুখী
জাতীয়	—	রাষ্ট্রীয়	**নির্ভীক**	—	ভয় মুক্ত, সাহসী
অভীষ্ট	—	বাঞ্ছিত	**পুরোভাগে**	—	সামনের দিকে

লেখক পরিচয় ঃ

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি বাংলা দেশের ঢাকা শহরে মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম । তাঁর পিতা সুসাহিত্যিক মণীশ ঘটক এবং মাতা ধরিত্রী দেবী । কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনা ও সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জীবনচর্যা, তাদের সংস্কৃতি ও সমস্যাই তাঁর সাহিত্যের অন্যতম বিষয় । তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা বিরসা মুন্ডা, অরণ্যের অধিকার, সমাজ ও সাহিত্য, হাজার চুরাশির মা প্রভৃতি । তিনি সাহিত্যের জন্য জ্ঞানপীঠ ও আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন এবং সমাজ সেবার জন্য পেয়েছেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ।

'বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী' তাঁর 'ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এক অশীতিপর বৃদ্ধার অসীম সাহস ও আত্মবলিদানের ঘটনা এই রচনাংশে বর্ণিত হয়েছে ।

পাঠ পরিচয় ঃ

এই গল্পটিতে লেখিকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে ৭৩ বছরের এক বৃদ্ধার উৎসাহ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন । ভারত স্বাধীন করবার জন্য একাগ্রচিত্ত হয়ে দেশের পুরুষ ও মহিলাকে উৎসাহিত করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করতে করতে নিজের প্রাণ আহুতি দিয়েছেন যিনি, তিনিই চির স্মরণীয় বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা ।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **সকলেই বিদ্রোহী রূপে এই আন্দোলনে..... দিয়েছিলেন ।**

(যোগ / রোগ)

2. **এই মহিয়সী নারী দেশের ডাকে ..... পড়লেন ।**

(লাফিয়ে / ঝাঁপিয়ে)

3. **শত সহস্র সত্যাগ্রহী ..... হারাল ও আহত হল ।**

(মান/ প্রাণ)

4. **ব্রিটিশ সৈন্যদল শুরু করল .....।**

(গুলিবর্ষণ / জল বর্ষণ)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. এই পাঠটিতে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে ?
6. শোভাযাত্রার নেত্রীর নাম লেখো ।
7. শোভাযাত্রা কাদের বিরুদ্ধে বের হয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

8. বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর রক্তে তমলুকের মাটি কী ভাবে পবিত্র হয়েছিল তার বিবরণ দাও ।
9. ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ-বাসী যে অভূতপূর্ব সংগ্রাম করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. **বাক্য রচনা করো ঃ**

শোভাযাত্রা,	নির্ভীক,
সংগ্রাম,	মহিয়সী,

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

বীরাঙ্গনা	মহিয়সী
লেখিকা	বয়স্কা

3. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

অজ্ঞ	স্বাধীনতা
অক্ষমতা	পবিত্র

4. সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

স্বাধীনতা	সর্বাগ্রে
সর্বাপেক্ষা	দৈহিক
নির্ভয়	অত্যাচার

5. এক কথায় প্রকাশ করো ঃ

জানবার ইচ্ছা.....

খাওয়ার ইচ্ছা.....

যার জন্ম আগে হয়েছে .....

যে মিষ্টি তৈরি করে.....

যিনি শিক্ষা দেন.....

যার পত্নী মারা গেছে .....

বিজ্ঞানমনস্কতা

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

ভদ্রলোক পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট । কলেজে পড়ান । বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব তাঁর নখাগ্রে। সেদিন ক্লাসে প্র্যাক্‌টিক্যালের সময় জামার হাতাটা একটু তুলতে হল । দেখা গেল লাল সুতোয় বাঁধা একটি কবচ । এক ছাত্র স্যারকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'স্যার, আপনি মাদুলি-কবচে বিশ্বাস করেন?' ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হলেন । তাড়াতাড়ি বললেলন, 'আরে না, না ! ঠাকুমা দিয়েছেন বুঝলে না । কী আর করা —!'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. অধ্যাপক ও নিরক্ষর চাষির মধ্যে কে বেশি বিজ্ঞান মনস্ক ?
2. ছাত্র স্যারকে মাদুলি কবচে তাঁর বিশ্বাস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্যার কী বললেন ?
3. বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্য জানলে কোন্ বোধ আরো শক্তিশালী হতে পারে ?
4. ভদ্রলোক কিসে ডক্টরেট ?

আর এক ভদ্রলোক প্রায় নিরক্ষর এক চাষি। পরনে একটা গামছা— শীতে বড়জোর একটা ছেঁড়া চাদর। বিজ্ঞানের বই দূরের কথা, কোনো বই-ই নেই তার আধভাঙা ঘরটায় । তাবিজ-কবজ-মাদুলি বা রত্নের আংটি দূরের কথা, পাঁজি-পুঁথিরও ধার ধারেন না তিনি।

এই বিজ্ঞানের অধ্যাপকের মতো লোক আমাদের চারপাশে প্রচুর । বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জন করলেও যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক নানা কাজ-কর্ম-আচার-আচরণে তাঁরা তুখোড়—কখনো নিজের বিশ্বাস থেকে, কখনো বা মা-ঠাকুমাদের দোহাই পেড়ে । আর এই নিরক্ষর চাষির মতো ব্যক্তি সংখ্যায় কমই—কিন্তু আছেন। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যা সঠিক মনে করেন, তা করেন, যা ভুল মনে করেন তা করেন না--কেন ভুল, কোথায় ফাঁকি এ সম্বন্ধে বিরাট কিছু না জেনেও।

এখন এই দুইদলের মধ্যে কারা বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ? নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় দলের প্রায়-নিরক্ষর

মানুষেরাই । আসলে বিজ্ঞান-মনস্কতা একটা বোধ, একটা চেতনা । যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে, তথ্য দিয়ে, সাধারণ জ্ঞান দিয়েই যা অন্তত কিছুটা আয়ত্ত করা যায় । বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্য জানলে যে বোধ আরো শক্তিশালী হতে পারে, বিজ্ঞানের হাজার তথাকথিত পাঠ্যবই প'ড়ে মুখস্থ ক'রে ডিগ্রি অর্জন করলেও সে বোধ নাও আসতে পারে ।

বিজ্ঞান মানে নিছক কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা নয়। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, যা মিথ্যার অন্ধকার কাটিয়ে সত্য জানতে আমাদের সাহায্য করে । বিজ্ঞানমনস্কতা এমন এক মানসিকতা ও চিন্তাপদ্ধতি, যার সাহায্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সাহায্যে যুক্তি দিয়ে, কারণ খুঁজে কোনোকিছু গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। বিজ্ঞানে গোঁড়ামি ও অন্ধ-বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। কোনো বিশ্বাস বা তথ্য ভুল প্রমাণিত হ'লে তাকে অনায়াসে বর্জন করা এবং এখনো অবাধ জানা জ্ঞানে কোনো কিছু সত্য প্রমাণিত হলে তাকে মুক্ত মনে গ্রহণ করা, —বিজ্ঞানমনস্কতার প্রধান দিক ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আদিম মানুষ কেন আত্মার কল্পনা করেছিল ?
2. ১৯৭৬ সালে কতজন বিজ্ঞানী জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন ?
3. বিজ্ঞানে কিসের কিসের স্থান নেই ?
4. বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্র্যাকটিক্যালের সময় জামার হাতটা তুললে তাঁর হাতে কী দেখা গেল ?

এক সময় আদিম মানুষ প্রাণরহস্যের সত্যিকারের সমাধান করতে না পেরে আত্মার কল্পনা করেছিল। তা ছিল প্রাচীন যুগের বৈজ্ঞানিক ভাবনারই ফল । কিন্তু এখন নানা পরীক্ষায় এবং তথ্যের সাহায্যে জানা গেছে যে, প্রাণের পেছনে রয়েছে অসংখ্য, জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া, আত্মা নয় । তাই বিজ্ঞান-মনস্ক ব্যক্তির কাছে আত্মা ও ঐ সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস (যেমন—প্রেতাত্মা, পূর্বজন্ম-জন্মান্তর ইত্যাদি) মানুষের মিথ্যা বিশ্বাস ও কল্পনা মাত্র ।

জ্যোতিষশাস্ত্রও (ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology, গণিত জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বা Astronomy নয়) এমনই এক কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা । নিছক কল্পনা ও মিথ্যা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে এ শাস্ত্র । অথচ বেশিরভাগ নিরক্ষর মানুষই নন, বহু বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিত মানুষও শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন ।

জ্যোতিষবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান নানা গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ভবিতব্য, শরীর এ সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে । বিভিন্ন অসুখ বা দুর্ভাগ্যকে জয় করতে তাই পলা, গোমেদ,

চুনি, ইত্যাদি নানা ধরনের গ্রহরত্ন হাতে আংটির সাহায্যে ধারণ করার ব্যবস্থা দেন জ্যোতিষীরা ।

কিন্তু বিজ্ঞান একে তো স্বীকার করে না, পরিবর্তে বিরোধিতাই করে । ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮৬ জন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী (যাঁদের মধ্যে ছিলেন ১৮ জন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী, ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরমন চন্দ্রশেখরও) জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে এক যৌথ বিবৃতি দেন । আমেরিকার 'দি হিউম্যানিস্ট' (সংখ্যা ৩৫) এবং ইংলন্ডের 'নিউ হিউম্যানিস্ট (সংখ্যা ৯১) পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল । সেখানে ওই বিশ্বশ্রেষ্ঠরা জানান যে, "জন্ম-মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে, এটি ভাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই । .....গ্রহ নক্ষত্রগুলির অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, তারা পৃথিবীর উপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য যে বল প্রয়োগ করে, তা অতি নগণ্য ।.....মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য কোন এক বর্হিশক্তির উপর নির্ভর করতে চায় । ভাবতে চায়, পৃথিবী বহির্ভূত কোন অলৌকিক বুঝি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে।" তারা এ ঘোষণাও করেন—জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের ভন্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে ।'

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনায় ও আচার - আচরণে, বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত । তা করতে গেলে এই স্লোগানকে হাতিয়ার করতেই হবে—

'সব কিছুতেই খুঁজবো কারণ—অন্ধভাবে মানব না।
বিজ্ঞানকে বই-এর পাতায় বন্দি করে রাখব না।'

জেনে রাখো ঃ

নখাগ্রে	— নখের অগ্রভাগে	**অপ্রস্তুত**	— সংকুচিত / লজ্জিত
নিরক্ষর	— অক্ষর জ্ঞান নেই যার	**বর্জন**	— ত্যাগ / বাতিল
অলৌকিক	— অবাস্তব / অতিপ্রাকৃত	**ডক্টরেট**	— একটি উপাধি
প্র্যাক্‌টিক্যাল	— প্রয়োগ করা	**কবচ**	— মাদুলি

লেখক পরিচয় ঃ

ভবানী প্রসাদ সাহু পেশায় অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক । তাঁর জন্ম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি নানা নিবন্ধ রচনা করে চলেছেন । তাঁর উল্লেখ্য গ্রন্থঃ 'ভূত - ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর', 'সংস্কার -কুসংস্কার', 'ওষুধ খেয়ে অসুখ', 'সুরা শরীর সর্বনাশা' প্রভৃতি । বর্তমান রচনাটি তাঁর 'সংস্কার - কুসংস্কার' গ্রন্থ থেকে সামান্য পরিবর্তিত রূপে সংকলিত ।

পাঠবোধ

ঠিক উত্তরটি বেছে লেখো ঃ

1. **ক্লাসে প্র্যাক্‌টিক্যালের সময় জামার হাতাটা একটু ..... হল ।**

(তুলতে/ নাবাতে)

2. **এক ছাত্র স্যারকে ..... করেই ফেলল ।**

(জিজ্ঞেস / উত্তর)

3. **বিজ্ঞানের বই দূরের কথা, কোনো ..... নেই তার আধভাঙা ঘরটায় ।**

(খাতাই / বই-ই)

4. **এক সময় আদিম মানুষ প্রাণরহস্যের সত্যিকারের সমাধান করতে না পেরে .....কল্পনা করেছিল ।**

(বৈজ্ঞানিক/ আত্মার)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

5. বিজ্ঞানমনস্কতা আসলে কী ?
6. ভারতীয় বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরমণ চন্দ্রশেখর কবে নোবেল পুরস্কার পান ?
7. বিজ্ঞান মানে কী ?

8. পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কীভাবে বাঁচতে হবে ?

9. নিরক্ষর চাষির বৈশিষ্ট্য কি ?

10. অসুখ বা দুর্ভাগ্যকে জয় করতে জ্যোতিষীরা কী ধারণ করতে বলে ?

বিস্তারিত ভাবে উত্তর দাও :

11. 'এই দুইদলের মধ্যে কারা বেশি বিজ্ঞানমনস্ক' এই দুইদলে কারা আছে ? এদের মধ্যে কারা বেশি বিজ্ঞানমনস্ক লেখো ।

12. জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখা হয়েছে 'বিজ্ঞানমনস্ক' পাঠ অবলম্বনে তা লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি :

1. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

নিরক্ষর	নির্ভুল
নিঃসন্দেহ	জন্মান্তর

2. বাক্য বানাও :

নিরক্ষর	দৈনন্দিন
অপ্রস্তুত	গোঁড়ামি
চেতনা	নক্ষত্র

3. বিপরীত শব্দ লেখো :

ভবিষ্যৎ	জ্ঞান,
আকর্ষণ	নিরক্ষর,
দুর্ভাগ্য	সত্য,

পদ্য

দাঁড় ও পাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

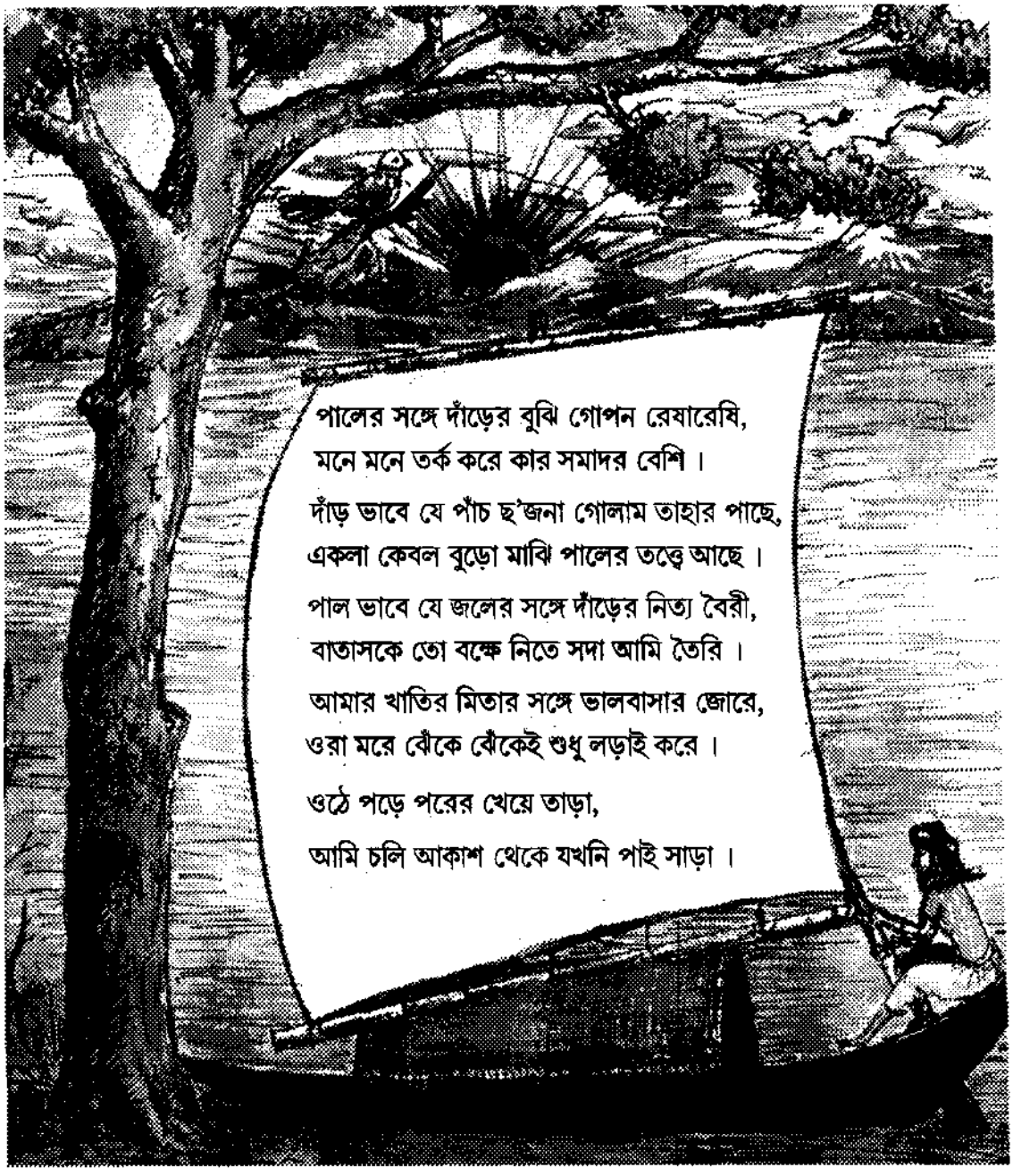

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি ।
দাঁড় ভাবে যে পাঁচ ছ'জনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তত্ত্বে আছে ।
পাল ভাবে যে জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরী,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে সদা আমি তৈরি ।
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই করে ।
ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া ।

জেনে রাখো ঃ

দাঁড় — নৌকা চালাবার জন্য লম্বা লাঠির মতো জিনিস

পাল — কাপড়ের তৈরি একধরনের বস্তু, যা হাওয়ার সাহায্যে নৌকা চালানোর কাজে লাগে

রেষারেষি — ঈর্ষা, আক্রোশ (রাগ)

সমাদর — অত্যধিক আদর, সম্মান ।

তত্ত্ব — পরিচালনা, দেখাশোনা করা

বৈরী — শত্রুতা

মিতা — বন্ধু

গোলাম — দাস, চাকর

কবি পরিচয় ঃ

১৮৬১ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় । পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী । — অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন । কবির পারিবারিক পরিবেশ তাঁর কাব্যচর্চার সহায়ক হয়েছিল । সাহিত্যের সকল শাখাতেই ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা । ছোট গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন - বিষয়ক নিবন্ধ, প্রভৃতি তার নিদর্শন । তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী । তাঁর রবীন্দ্র সংগীত সংগীত জগতে এক বিশেষ শাখা রূপে পরিগণিত হয় । ১৯১৩ সালে তিনি ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান । ১৯৪১ সালে কবির দেহবসান ঘটে ।

পাঠ পরিচয় ঃ

কাজ করতে হলে, ডান এবং বাম — দুটি হাতেরই প্রয়োজন হয় । কারও সাহায্য বেশি দরকার, কারও বা কম । ঠিক তেমনি নৌকা চালাতে গেলে, দাঁড় আর পাল — দুয়ের কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না ।

দাঁড় আর পাল । নদীর বুকে নৌকার ভেসে চলার এদের দুইয়েরই সাহায্য প্রয়োজন । দাঁড় বাইতে পাঁচ - ছয় জন লোকের দরকার হয় । এতগুলি লোকের সাহায্যে চালিত হয়ে দাঁড় গর্বিত বোধ করে । কিন্তু পালের জন্য একা মাঝিই যথেষ্ট । নদীর বুকে হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে নৌকা অনায়াস গতিতে এগিয়ে চলে। জলের সাথে, আকাশের সাথে পালের যেন ভালোবাসার সম্পর্ক ।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি ..... রেষারেষি ।**

   (ক) ভীষণ (খ) গোপন (গ) দারুণ

2. **একলা কেবল বুড়ো ..... পালের তত্ত্বে আছে ।**

   (ক) চালক (খ) নাবিক (গ) মাঝি

3. **পাল ভাবে যে জলের সঙ্গে ..... নিত্য বৈরী ।**

   (ক) দাঁড়ের (খ) হালের (গ) পালের

4. **আমার খাতির ..... সঙ্গে ভালোবাসার জোরে ।**

   (ক) বন্ধুর (খ) মিতার (গ) সখার

5. **আমি চলি ..... থেকে যখনি পাই সাড়া ।**

   (ক) আকাশ (খ) বাতাস (গ) জল

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. কাদের মধ্যে গোপন রেষারেষি ছিল ?

7. দাঁড়ের জন্য কজন গোলামের প্রয়োজন হয় ?

8. পালের দেখাশোনা কে করে ?

9. জলের সঙ্গে কার নিত্য শত্রুতা ?

10. পালের খাতির কার সঙ্গে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. দাঁড় ও পাল কোন কাজে ব্যবহার করা হয় ?

12. দাঁড়ের গোলামরা কার সঙ্গে লড়াই করে ?

13. বাতাসের সঙ্গে কার মিত্রতা ?

14. পাল আকাশ থেকে কিসের সাড়া পায় ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

15. দাঁড় আর পালের কেন রেষারেষি ছিল ?

16. পাল সম্পর্কে দাঁড় কী ভাবতো ?

17. দাঁড়ের বিষয়ে পাল কী চিন্তা কোরতো ?

18. দাঁড় ও পাল কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন, বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বাক্য বানাও ঃ

রেষারেষি	খাতির	বৈরী
সমাদর	লড়াই	সাড়া

2. পদ পরিবর্তন করো ঃ

তর্ক　　গোপন

জল　　গোলাম

3. এক কথায় লেখো ঃ

যে তর্ক করে ——

যে নৌকা চালায় ——

4. নৌকার বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো ।

5. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

গোপন	পাছে	পার
নিত্য	বেশি	একলা

আলোচনা করো ঃ

নৌকার বিষয়ে তোমাদের হয়তো বিস্তারিতভাবে তেমন কিছু জানা নেই । যারা গ্রামাঞ্চলে থেকেছ, তারা হয়ত নৌকা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানো । পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে নিজেদের ধারণা স্পষ্ট করো । এই ব্যাপারে শিক্ষকও তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন ।

করতে পারো ঃ

দাঁড় ও পাল সহ নৌকার ছবি আঁকতে পারো । কার্ডবোর্ড দিয়ে নৌকা বানাতে চেষ্টা করো । কবিতাটি আবৃত্তি করো ।

দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র

কাশীরাম দাস

ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র হিংসা বড় পাপ ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ।।
অহিংসক পান্ডবের না করিবে হিংসা ।
শান্ত হৈয়া থাক পুত্র, পাইবে প্রশংসা ।।
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন ।
কহ পুত্র, নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ।।
আমারে গৌরব করে সব নৃপবর ।
ততোধিক রত্ন দিবে তোমারে বিস্তর ।।
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার ।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ।।
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন ।
স্বধর্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ।।
স্বকর্মে উদ্‌যোগ করে পর-উপকারী ।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ।।
পর নহে নিজ ভাই পান্ডুর নন্দন ।
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন ।।

জেনে রাখো ঃ

নৃপবর	—	মশাই রাজা	**বিস্তর**	—	অনেক
অসৎ	—	মন্দ	**নন্দন**	—	পুত্র
মার্গ	—	পথ	**দুষিবে**	—	দোষী বলবে
সদাকাল	—	সর্বদা	**কদাচন**	—	কখনো

কবি পরিচয় ঃ

কাশীরাম দাসে র সঠিক জন্ম তারিখ জানা নেই তবে পন্ডিতগণের অনুমান তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দির মধ্য ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রাম । পিতার নাম কমলাকান্ত । অনুমান করা হয় কাশীরাম দাসের মহাভারত ষোড়শ শতকের শেষের দিকে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল । কেউ কেউ বলেছেন যে কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করেন । অনেকে এ কথা মানেন না । সংস্কৃত মহাভারতের মতো বিশালকায় গ্রন্থকে প্রাদেশিক ভাষায় নতুন রূপ দিয়ে কোন চির স্মরণীয় স্থান দখল করেছেন । তাঁর নামে সত্যনারায়ণের পুঁথি, স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব, ও নলোপাখ্যান গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় । তিনি পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন বলে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন ।

কাব্য পরিচয় ঃ

এই কবিতায় ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্র দুর্যোধনকে উপদেশের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন যে পরের প্রতি হিংসা করলে নিজের দুঃখ হয় । পান্ডবেরা নির্দোষ ওদের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়। পান্ডবদের প্রতি হিংসা করলে এই জগতে কেউ কৌরবদের প্রশংসা করবে না । যদি নিজের বংশের গৌরব কীর্তি চাও তবে পরের দ্রব্যাদির প্রতি লোভ ত্যাগ করতে হবে নইলে সংসারের লোকেরা কৌরবদের নিন্দা করবে। পান্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের ছোট ভাইয়ের সন্তান, ওরা পর নয়। সুতরাং দুযোধনকে নিজ কর্মে লিপ্ত হতে বলেছেন। পান্ডবদের প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করতে বলেছেন ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **কাশীরাম দাস লিখিত কবিতাটির নাম ..... ।**

(দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র, বিভীষণ ও রাবণ)

2. **'দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র' কবিতাটি ..... লিখেছেন ।**

(কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. কার মনে বড়ো তাপ ?
6. কী করলে দুর্যোধন প্রশংসা পেতে পারে ?
7. অসৎ পথে যাওয়ার কী পরিণাম হতে পারে ?
8. দুর্যোধন কাদের প্রতি ঈর্ষা করত ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

9. ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কেন উপদেশ দিয়েছিলেন ?
10. একজন স্বধর্মে ও স্বকর্মে থাকলে তার কিরূপ উপকার হবে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

11. কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখো ।
12. ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনকে কী - কী উপদেশ দিয়েছিলেন ? উপদেশগুলি লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো

প্রশংসা — ধর্ম —

শান্ত — নিজ —

হিংসা — ঈর্ষা —

2. পদ পরিবর্তন করো ঃ

তাপ — অসৎ —

সংসার — হিংসক —

দুঃখ — বিচার —

3. বহুবচন লেখো

নৃপ — বই —

ছাত্র — রাজা —

4. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

যথোচিত — পরোপকারী —

উদ্‌যোগ — ততোধিক —

বঙ্গ ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা !
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে;
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা !
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা;

জেনে রাখো ঃ

নিত্যানন্দ	—	প্রভু নিত্যানন্দ
গোরা	—	গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
বিদ্যাপতি	—	মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে আগে বাংলার কবি বলা হোত ।
চন্ডী	—	কবি চন্ডীদাস
গোবিন্	—	কবি গোবিন্দ দাস
হেম	—	কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মধু	—	কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বঙ্কিম	—	লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীন	—	কবি নবীনচন্দ্র সেন
রবি	—	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মোদের	—	আমাদের
গরব	—	'গর্ব' থেকে কবিতার ভাষায় 'গরব' হয়েছে, গৌরব বোধ ।
ক্লান্তি নাশা	—	ক্লান্তি দুর করে যা
জিনে	—	জয়লাভ করে
সাঙ্গ	—	শেষ করা
বোলে	—	কথা বলা ভাষায়
বীণে	—	মূল শব্দটি বীণা, একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
যাদু	—	মনকে মোহিত করা
জগৎ	—	পৃথিবী

কবি পরিচয় ঃ

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ফরিদপুর জেলায় ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে । তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি ছিলেন । লক্ষ্ণৌতে তিনি ব্যারিষ্টারী করতেন এবং সেই সঙ্গে কাব্য রচনার ধারাকেও অব্যাহত রেখেছিলেন । মাতৃভাষাচর্চাকে সারাজীবন প্রাধান্য দিয়েছেন । এর জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও ভালবাসা লাভ করেন । তাঁর লেখা 'বঙ্গভাষা' কবিতা যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে । ১৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয় । 'গীতিকুঞ্জ'ও 'কাকলি' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম ।

কাব্য পরিচয় ঃ

কবি নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গর্ব অনুভব করে জানিয়েছেন মায়ের কোলে সন্তান যেমন ভালবাসা ও পরম শান্তির আশ্রয় পায় তেমনি করে কবিও বাংলা ভাষার মধ্যে সেই শান্তি পেয়েছেন। এই ভাষাতে গান গেয়ে চাষি ধান কাটে, মাঝি নৌকা চালায়, বাউল গ্রামের পথে একতারাতে সুর তোলে। এই ভাষাতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ দেশে ভক্তি ধারা ছড়িয়ে ছিলেন । এই ভাষাতেই গদ্য ও পদ্য রচনা করে কবি ও লেখকগণ বিখ্যাত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বময় এই ভাষাকে পরিচয় দিয়েছেন । কাব্যের শেষে কবি জানিয়েছেন, জন্মের পর যেমন প্রথম বাংলা ভাষাতেই মা বলে ডেকেছেন তেমনি জীবনের শেষ দিনটিতেও যেন এই ভাষাতেই ঈশ্বরের নাম করতে পারেন ।

পাঠ পরিচয় ঃ

বাংলা ভাষা বঙ্গবাসীর প্রাণ, এই ভাষাতে কথা বলে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয় । বাঙালী কৃষক ও মাঝিরা এই ভাষায় গান গেয়ে কাজে উৎসাহ পান । এই ভাষাতে লেখক কবিরা এমন কি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধর্মপ্রচার করে অমরত্ব লাভ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলী' লিখে 'নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এর ফলে বাঙলাভাষা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে জেনে রাখো যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন । বঙ্গভাষা কবিতাটি সহজ ও সরল ভাষায় লেখা শ্রুতি মধুর কবিতা ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. অতুল প্রসাদ সেন লিখিত কবিতাটির নাম কী ?
2. কোন ভাষার জন্য আমরা গর্ববোধ করি ?
3. কোন ভাষা আমাদের দুঃখ ক্লান্তি দূর করে ?
4. রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে জগৎ জুড়ে নাম করেছেন ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, রবি — এঁদের পুরো নাম লেখো ।
6. বাংলা ভাষা কিভাবে আমাদের কর্মক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে - তার দুটি উদাহরণ বঙ্গভাষা কবিতাটি থেকে লেখো ।

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

7. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রতি কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো ।
8. " ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
   ডাকণু মায়ে মা মা বলে,
   ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
   সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা ।"

'বঙ্গভাষা' কবিতার এই চারটি লাইনে কবি কী বলেছেন ? তুমি নিজের মতো করে বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

আশা,	দেশ	শান্তি,
সুখ	কাঁদা	প্রথম

2. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

ভাসা, ভাষা	বীণা, বিনা
দেশ, দ্বেষ	আসা, আশা

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

গাণ	দূঃখ	তির্থ
মধূ	যাদূ	প্রসাদ

রামসুক তেওয়ারী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসেছিল এই দেশে রামসুক তেওয়ারি
অধিবাসী হবে 'বুন্দী' কি 'রেওয়ারি !

বুক ছিল দরাজ, কি গভীর পেট্‌টি !
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টী ।

আধসের চানা খেত চিবাইয়া দন্তে,
মিছরির সরবৎ কুস্তির অন্তে ।

বাঙ্‌লায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা ।

প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত ।

কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার,
ভুঁড়ি তার কমে গেছে, — বেড়ে গেছে নাক তার ।

খায় দাদ্‌খানি চাল, ডুমুরের ছেঁচকী,
তবু ওঠে উদ্‌গার, কভু ওঠে হেঁচকি ।

বড়া, বড়ি ট্যাবলেট পর্পটি - চূর্ণ;
অনুপান, অবলেহে ঘর তার পূর্ণ ।

ভাঁজিবার মুদগর - শৌর্য্যের উৎস
দুরে পড়ে খোঁজ আজ মদ্‌গুর মৎস্য ।

ভাবেনি সে হবে তার এতবড় 'চেঞ্জই',
পাঞ্জাবী হল তার পুরাতন গেঞ্জি ।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া ।

করে দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ
যে ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ ।

ভোরে ঘোরে খোলামাঠে রামসুক সাথে সে
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে ।

চা ছাড়িয়া রামসুক উঠলো যে মুটিয়ে,
অর্হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটী হে ।

চা খেলেই তাড়া করে, — করে নাক কেয়ার-ই,
খাসা আছে, সুখে আছে, রামসুক তেওয়ারী ।

জেনে রাখো ঃ

দেশ	—	এক - একটি প্রদেশকে কবি এখানে দেশ বলে উল্লেখ করেছেন			
দন্ত	—	দাঁত	**নিত্য**	—	রোজ
মৎস্য	—	মাছ	**বে-ভাষা**	—	অন্য ভাষা

দরাজ	—	প্রশস্ত	**অন্ত**	—	শেষ
শৌর্য	—	সাহস	**চেঞ্জ**	—	পরিবর্তন

কবি পরিচয় ঃ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক বর্ধমান জেলার কোগ্রামে ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন । বি. এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং মাথরুন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে অবসর গ্রহণ করেন । তাঁর কবিতায় বাংলার গ্রামীণ সংস্কার, পল্লী প্রীতি, বৈষ্ণব ভাবরস, স্নিগ্ধ মাধুর্য দান করেছে। 'বনতুলসী' উজানী, একতারা, বীথি, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

কাব্য পরিচয় ঃ

বিহার প্রদেশের বাসিন্দা রামসুক তেওয়ারী ভুট্টার ছাতু, ছোলা ইত্যাদি খেয়ে দরাজ বুকে, গভীর পেট, মজবুত দাঁতের অধিকারী ছিল । কিন্তু বাংলায় এসে সে সকাল সন্ধ্যায় চা খাওয়ার নেশা ধরেছে । তাতে তার অম্বল, পিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দিয়েছে । খাওয়া গেছে কমে । এমন রোগা হয়েছে যে পাঞ্জাবী যেন পুরানো গেঞ্জির মতো হয়ে গেছে । ডাক্তারের ওষুধেও কোন কাজ হচ্ছে না । শেষে দেশ থেকে 'দেশোয়ালী ভাইয়া' এসে প্রথমেই তার চা খাওয়া বন্ধ করাতে সে তার শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেলো ।

পাঠ পরিচয় ঃ

শব্দগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় লেখো ঃ

(ছাতু, তুলসীর, গেঞ্জি, রুটি, লেট্টি, ডাল, রামসুক তেওয়ারী)

1. **ভুট্টার ..... খেত, সের দুই ..... ।**

2. **পাঞ্জাবী হল তার পুরাতন ..... ।**

3. **..... রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে ।**

4. **অর্হরের ..... খায়, জোয়ারের ..... হে ।**

5. **খাসা আছে, সুখে আছে, ... ।**

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. 'এই দেশ' বলতে কবি এখানে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন ?
7. প্রাতে আর সন্ধ্যায় সে রোজ কী খায় ?
8. কুস্তির শেষে সে কী খেত ?
9. রামসুকের অসুখের সংবাদ পেয়ে কে তার কাছে এসেছিল ?
10. দেশোয়ালী ভাইয়া রামসুকের কী খাওয়া বন্ধ করলে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. রামসুক তেওয়ারী কি কি খেতো ?
12. 'পরকাল ফর্সা' বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন ?
13. কোন প্রদেশে এসে, কী খাওয়ার নেশা রামসুক তেওয়ারীর সর্বনাশ ডেকে আনলো ?
14. রামসুকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

15. চা খাওয়া শুরু করার পর রামসুক তেওয়ারীর শরীরে কি কি অসুবিধা দেখা দিল ?
16. যার যা খেয়ে অভ্যাস । সেই অভ্যাসে অনিয়ম ঘটলে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের রামসুক তেওয়ারী ।
    — কবিতাটি অবলম্বনে এ বিষয়ে নিজের মন্তব্য দাও ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

ভাই	পুরাতন	প্রথম
ফর্সা	অন্ত	পরকাল

2. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

বর্ষা, বর্শা	পূর্ণ, পুণ্য
পাঠ, পাট	দেশ, দ্বেষ

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

দেস	পুরাতণ	অশুখ
সন্ধা	সূখ	পুন্য

4. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

চা, পান, সুপারি, খৈনি ইত্যাদি যে কোনো নেশার জিনিস গ্রহণ করা

অধম ও উত্তম

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায় —
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে,
বিষ লেগে গেল তায় ।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে, হায়
জাগে শিয়রের আগে ।
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন, বাবা, ছেড়ে দিলে তারে
তোমার কি নেই দাঁত ! "
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল,
"তুই রে হাসালি মোরে,

দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়ে
দংশি কেমন করে ?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কি রে
মানুষের শোভা পায় ?"

জেনে রাখো ঃ

অধম	—	নীচ	**ভর্ৎসনা**	—	তিরস্কার
উত্তম	—	শ্রেষ্ঠ	**আর্ত**	—	পীড়িত
শিয়রের	—	মাথার	**দংশি**	—	কামড়াই

কবি পরিচয় ঃ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার নিমতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । এঁর লেখা কবিতাগুলি এক একটি এক - এক রকম ছন্দে লেখা নানারকম ছন্দ নিয়ে কবি তাঁর কাব্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন । তাই এঁকে ছন্দের জাদুকর বলা হয় । এঁর লেখা 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থ সলিল', 'কুহু ও কেকা', তীর্থ রেণু বাংলা কাব্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে । ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন ।

কাব্য পরিচয় ঃ

কাজের ও ব্যবহারের মাধ্যমে অধম ও উত্তম মানুষকে চেনা যায় । মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যে কাজ অন্যান্য জীব করতে পারে, মানুষ কখনই তা পারে না । তাই অধম জীব কুকুর মানুষকে কামড়ালেও উত্তম মানুষ তাকে কামড়ানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না ।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক শব্দটিতে (√) দাগ দাও ঃ

1. **কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের .....** (পায় / গায়)
2. **রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় .....** (জাগে / রাগে)
3. **তুমি কেন, বাবা ছেড়ে দিলে .....** (মোরে / তারে)
4. **কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে .....** (গায় / পায়)
5. **তা বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে ..... শোভা পায় ?** (পশুর / মানুষের)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. কুকুর কাকে কামড়ে ছিল ?
7. পথিক ঘরে ফিরে কেন জেগে ছিলেন ?
8. মেয়েটি তার বাবার কোথায় বসে জাগে ?
9. মেয়েটি বাবাকে কী বলেছিলো ?
10. এই কবিতায় কে অধম ও কে উত্তম ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. বাবা তার মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছিলেন ?
12. কুকুর কামড়ানোর ফলে পথিকের কী হয়েছিল ?
13. মেয়েটির কোন কথা শুনে বাবা হেসে ছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

14. কবিতাটিতে কবি অধম ও উত্তম সম্পর্কে কী বোঝাতে চেয়েছেন ?
15. অন্যের প্রতি মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. **নিচে কতগুলি সাধু ভাষার শব্দ দেওয়া হলো সেগুলির চলিত রূপ লেখো ।**

আসিয়া	
রাত্রে	হাসিয়া
তাহার	কহিল
রাখিয়া	দংশি

2. **পদ পরিবর্তন করো ঃ**

বিষ	ঘর
দাঁত	কাজ

3. **লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ**

বাবা	মেয়ে
বেচারা	সুন্দর

4. **শব্দগুলি দিয়ে বাক্যে তৈরি করো ঃ**

কামড়	ভর্ৎসনা
রাত্রি	আর্ত
শিয়র	দংশন

5. তোমার স্কুলের একটি ছোট্ট মেয়ে যদি হঠাৎ এসে তোমাকে ধাক্কা দেয়, তখন তুমি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে ? তা পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

পড়ার আগে ভাবো

শিক্ষা গ্রহণ করে যে সেইতো শিক্ষার্থী বা ছাত্র । তোমার স্কুলে চার দেয়ালের মধ্যে বসে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, কিন্তু জানো কি এই ব্রহ্মান্ড এই বিশ্ব প্রকৃতি এক বিরাট স্কুল । এই প্রকৃতি থেকে আমরা প্রতিদিন শিক্ষা গ্রহণ করি । আমরা সবাই এই প্রকৃতির ছাত্র ।

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে ।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল্-খোলা হই তাই রে ।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মেদুর,

মধুর কথা বলতে ।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,—
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে ।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা ।
ঝরণা তাহার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা ।
বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র,
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সে-সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র ।

জেনে রাখো ঃ

উদার — মহৎ

কর্মী — যে কাজ করে

মৌন — নির্বাক, যে কথা বলে না

দিলখোলা — মনের উদারতা

মন্ত্রণা — পরামর্শ

মেদুর — কোমল

অন্তর — মন

সহিষ্ণুতা — সহ্য করার ক্ষমতা

পাষাণ — পাথর

ঝরণা — পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া জলধারা

শ্যাম — সবুজ

বনানী — বড়ো বন

সরসতা — সরস ভাব, রসালো ভাব

বিশ্বজোড়া — সারা পৃথিবী ভরে

কৌতূহলে — আগ্রহ সহকারে

কবি পরিচয় ঃ

সুনির্মল বসু (১৯০২ - ৫৭)

গিরিডিতে জন্ম । ছোটবেলা সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে কবি হতে অনুপ্রাণিত করে । ১৯২০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন । পরে কলকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজে ভর্তি হন । গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন । এরপর অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজে ভর্তি হন । ছড়া, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, গল্প, উপন্যাস রূপকথা, কৌতুক নাট্য প্রভৃতি শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বহু বিষয়ে লেখেন । ১৩৬৩ সালে ভুবনেশ্বরী পদক পান । তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈ চৈ, হুলুস্থুল, কথা শেখা, পাততাড়ি, মরণের ডাক ছন্দের টুং টাং ইত্যাদি । সম্পাদনা করেন — ছোটদের চয়নিকা, ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন । আত্মজীবনী — 'জীবন খাতার কয়েক পাতা' ।

কাব্য পরিচয় ঃ

আকাশকে কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না, তার কাছ থেকে কবি গ্রহণ করলেন উদারতা। বায়ু যেমন অবিরত বয়ে চলেছে, কোনো অলসতা নেই, তেমনি নিরলস কর্মি হতে শিখলেন । পাহাড়ের কাছ থেকে নীরবে সবার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে । মনের সকল সংকীর্ণতাকে দূর করে খোলা মাঠের মতো মনকে রাখতে । নিজের ভিতরে যে জ্ঞানের আলো আছে তাকে সূর্যের মতো স্বমহিমায় প্রকাশিত করতে শিখলেন । চাঁদের কাছ থেকে কবি শিখেছেন স্বভাবে কোমলতা ও মধুর কথা বলা । সাগরের আর একটি নাম রত্নাকর অর্থাৎ সাগরের গভীরে আছে রত্নের ভান্ডার কবি নিজের হৃদয়কে সাগরের মতো রত্নে ভরে তুলতে চান । হৃদয়ের রত্ন হোল ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, ভালবাসা প্রভৃতি । নদী শেখালো এগিয়ে যেতে । মাটি শেখালো সহ্য করার ক্ষমতা । পাষাণের কাছে শিখলেন দৃঢ়তা । ঝর্ণার কাছে শিখলেন সুর ও ছন্দ, সবুজ বনের কাছে পেলেন মনকে সজীব, আনন্দময় করে তোলার ক্ষমতা । কবি কাব্যের শেষে এই বিশাল বিশ্বকে পাঠশালা বলে উল্লেখ করেছেন । প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এই বিশ্ব প্রকৃতির খাতার পাতা থেকে কবি পাঠ গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন ।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. আকাশ আমায় শিক্ষা দিল ।

ক. উদার হতে
খ. সাহসী হতে
গ. ভীতু হতে
ঘ. বলশালী হতে

2. বায়ু শেখায় ।

ক. কর্মী হতে
খ. অকর্মণ্য হতে
গ. চটপটে হতে
ঘ. কুঁড়ে হতে

3. আপন তেজে জ্বলতে কে বলে ?

ক. চাঁদ
খ. সূর্য
গ. জঙ্গল
ঘ. পাহাড়

4. সহিষ্ণুতা কী ?

ক. ভয় পাওয়া
খ. নির্ভীক হওয়া
গ. সহ্য করার ক্ষমতা
ঘ. সহ্য না করার ক্ষমতা

5. প্রাণে গান জাগিয়ে তোলে কে ?

ক. ঝরণা
খ. বায়ু
গ. নদী
ঘ. পাহাড়

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

6. আপন বেগে চলার মন্ত্র কবি কার থেকে পান ?
7. পাষাণ কবিকে কিসের দীক্ষা দিয়েছে ?
8. সূর্যের কাছ থেকে কী মন্ত্রণা পাওয়া গেলো ?
9. সাগর কী শেখাতে চায় ?
10. বিশ্বকে কবি কার সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. কে কী ভাবে প্রাণে গান জাগালো ?
12. নদীর কাছ থেকে আপন বেগে চলার শিক্ষা কী ভাবে পাই ?
13. মানুষ দিনরাত প্রকৃতির কাছ থেকে কীভাবে শিখে চলেছে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

14. কবি সাগর, নদী, মাটি ও পাষাণের কাছ থেকে কী কী শিক্ষা লাভ করেছেন, 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি অনুসরণে নিজের ভাষায় লেখো ।
15. এই কবিতাটিতে কবি নিজেকে 'সবার ছাত্র' বলেছেন কেন ?

পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

1. সূর্য একটি তারা । তারার কাজ কী ?
2. বায়ুর কী কী উপকারিতা ?
3. নদীতে বন্যা এলে কী কী ক্ষতি হয় ?
4. বন জঙ্গল কাটলে আমাদের ভাল হবে, না ক্ষতি হবে ?

আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ ক্লান্তিনাশা ।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী গোবিন্,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা ।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে মা গো,
জগৎ করে যাওয়া আসা ।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা ।

রাখাল ছেলে

জসীমউদ্দীন

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?'
'ওই যে দূরে মাঠের পারে সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশে ছড়িয়ে পড়া, আবির রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা,
সেথায় যাব ও ভাই এবার আমায় ছাড়ো না !'

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও ?
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও ।'
'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশিরঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে ।

আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত-হাওয়া ভাই,
সরষেফুলের পাপড়ি নেড়ে ডাকছে মোরে তাই ।

চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে যেন— গাঁয়ের রাখাল, একটু খেলে যা ।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা ।
সারাটা দিন খেলতে পারি জানিনে কো বসা ।
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে, ভাই,
সাঁকের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই ।'

(সংক্ষেপিত)

জেনে রাখো ঃ

বারেক — একবার

গাঁ — গ্রাম

চামর — চমরী গরুর লোম যুক্ত লেজ দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাতাস করার পাখা।

ধাও — যাও

সাঁঝ — সন্ধ্যা

পুব — পূর্ব

স্বপন — স্বপ্ন

নাও — নৌকা

মিঠেল — মিষ্টি

মোরে — আমাকে

কবি পরিচয় ঃ

কবি জসীমউদ্দীন ১ লা জানুয়ারী, ১৯০৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার তামবুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা মৌলভি আন্‌সারউদ্দীন আহমদ, মা আমিনা খাতুন । পল্লিকবি রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন । বিখ্যাত কাব্য 'নকসী কাঁথার মাঠ' । এছাড়া 'এক পয়সার বাঁশি', 'ধানক্ষেত্র', 'মাটির কান্না', 'রাখালী', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

কাব্য পরিচয় ঃ

'রাখাল ছেলে' কবির পল্লীপ্রেমের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা । এখানে বাংলাদেশের গ্রামের সৌন্দর্য ও তার সঙ্গে প্রাণের নিবিড় যোগ এবং গ্রাম প্রকৃতিকে নিজের মায়ের মতো ভালবাসার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

কবি পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রাখাল ছেলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । গ্রামের প্রান্তে সবুজ বনের মাঝে শুকনো সোনালী পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট কুটির সেখানে তার মা থাকে । কুটিরের সামনে হাওয়াতে দোল খাওয়া কলাগাছের পাতা যেন পাখার বাতাস দিচ্ছে । ভোরের শিশির যেন পা ধুইয়ে দেয় । খোলা আকাশে অস্ত সূর্যের কিরণ যেন আবিরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে । ভোরের প্রকৃতি অন্য সাজে সেজেছে । সর্ষে ফুল, মটরশুঁটির ছড়িয়ে থাকা লতানো গাছ এসব কিছুর মাঝে রাখাল বালকের সারাদিন ক্ষেত চাষ করা, ফসল ফলানো এ যেন মাটির ডাকে মাটির সঙ্গে আনন্দের খেলা তার ।

পাঠবোধ ঃ

শব্দগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় লেখো ঃ

(গাঁয়ের রাখাল, সাঁঝের বেলা, শিশির, বারেক, আমার মা)

1. **রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, ... ফিরে চাও**

2. **কলার পাতা দোলায় চামর ..... ধোয়ায় পা,**

3. সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে ..... ,

4. বলছে যেন ..... , একটু খেলে যা,

5. ..... কইব কথা, এখন তবে যাই ।

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটি কোন কবির লেখা ?

7. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটিতে প্রশ্ন করেছেন কে ? উত্তর দিচ্ছে কে ?

8. পূর্বদিকের আকাশে কী ছড়িয়ে পড়েছে ?

9. রাখাল ছেলের পা দুখানা কে জড়িয়ে ধরেছে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

10. রাখাল ছেলে কোথায় ও কেন যেতে চেয়েছিল ? সেখানে কে আছে ?

11. রাখাল বালকের গ্রামটি কী দিয়ে ঘেরা ?

12. ঘুম থেকে জেগে রাখাল ছেলেটি কী কী দেখেছিল ?

13. রাখাল বালকের সঙ্গে কারা খেলতে চেয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

14. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটিতে গ্রামের রূপের যে সুন্দর একটি বর্ণনা আছে, তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো ।

15. রাখাল ছেলেটি এখন নয়, সন্ধ্যা বেলায় কথা বলবে বলেছে — কেন ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. শব্দগুলিকে বহুবচনে লেখো ঃ

গাছ	ছেলে	ঘর
কুটির	চামর	ফুল

2. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে লেখো ঃ

গাঁ	দিন	সন্ধ্যা
মাঠ	রঙ	সোনা

3. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

আকাশ	বাঁকা	একলা
গাঁ	বসা	পুব (পূর্ব)

গাছ কেটো না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পড়ার আগে ভাবো ঃ

গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু। গাছ না থাকলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাও যে সম্ভব নয়, তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আমাদের শপথ করা উচিত আর কখনো গাছ কাটবো না ।

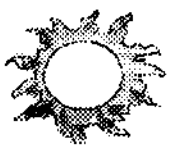

কাল যে ছিল গাছের সারি
আজ পড়েছে কাটা,
রাস্তা দিয়ে তাই ত ভারী
শক্ত হল হাঁটা ।
রোদ্দুরে গা যাচ্ছে পুড়ে
এখন রাস্তাঘাটে,
বাইরে গেলেই ভর দুপুরে
মাথার চাঁদি ফাটে ।
গাছগুলো সব দাম না-নিয়ে
ফুল দেয় আর ফল দেয় ।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমিয়ে
বৃষ্টি নামায়, জল দেয় ।
ধস্‌তে দেয় না মৃত্তিকাকে
শেকড়গুলোকে কাটলে কি হয়,
তাও তো দেখছ তুমি,
গাঁ গঞ্জ আর জীবন্ত নয়,
শুকনো মরুভূমি ।
হারিয়ে গেছে মাথার উপর
গাছের সবুজ পাতা ।
জ্বলছে বাজার রাস্তা ও ঘর
এই নাকি কলকাতা !
তাই ত বলি, গাছ কেটোনা,
গাছকে রাখো ধরে,
তা নইলে ভাই লক্ষ্মীসোনা
বাঁচবে কেমন করে ?

জেনে রাখো ঃ

চাঁদি — ব্রহ্মতালু

মৃত্তিকা — মাটি

গঞ্জ — বাজার / বাণিজ্যের স্থান

কবি পরিচয় ঃ

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। একসময় ছোটোদের পাক্ষিক 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিলেন । তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'উলঙ্গ রাজা', 'নীলনির্জন', 'কলকাতার যীশু' প্রভৃতি । ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'উলঙ্গ রাজা', কবিতাটির জন্য 'আকাদেমি পুরস্কার' পান । তাঁর সংকলিত 'কবিতা গুচ্ছ' থেকে আলোচ্য কবিতাটি নেওয়া হয়েছে ।

কাব্য পরিচয় ঃ

পথের দুপাশে সবুজ গাছের সারি । এই ছায়া ঘেরা পথে গ্রীষ্মের দুপুরে কবির আরামের পথ চলা। হঠাৎ গাছগুলি কেটে ফেলায় পথ চলার কষ্ট কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন । একটি গাছ ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দেয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামায় আবার শিকড় দিয়ে মাটিকে বেঁধে রাখে । বাতাসকে দূষণমুক্ত করে । গাছ না থাকলে সব মরুভূমি হয়ে যাবে, কেউই বেঁচে থাকবে না । তাই এই কবিতার মাধ্যমে কবি সবাইকে অনুরোধ করেছেন কেউ যেন গাছ না কাটে ।

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তর বেছে লেখো

"কাল যে ছিল..... সারি,	(নদীর / গাছের)
আজ পড়েছে..... ,	(ফুল / কাটা)
রাস্তা দিয়ে তাই ত ..... ,	(হাল্কা / ভারী)
..... হল হাঁটা ।"	(সরল / শক্ত)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

2. রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না কেন ?

3. ভর দুপুরে বাইরে গেলে মাথার চাঁদি ফাটে কেন ?

4. গাছ আমাদের কী দেয় ?

5. গাছ কাকে শক্ত করে বাঁধে ?

6. গাঁ গঞ্জ এখন কেন শুকনো মরুভূমির মতো লাগে ?

7. মাথার উপর থেকে কী হারিয়ে গেছে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

8. রোদে গা পুড়ে যায় কেন ?

9. গাছ কীভাবে আমাদের জল দেয় ?

10. গাছগুলোকে কাটলে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় ?

বিস্তারিত ভাবে উত্তর দাও ঃ

11. কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখো ।

12. কবিতাটি অনুসরণে গাছের উপকারিতা কী তা বুঝিয়ে লেখো ।

13. কবি গাছ কাটতে নিষেধ করেছেন কেন ?

14. দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো ঃ

আকাশ ....

গাছ ....

জল ....

15. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো ঃ

শক্ত — কাল — জীবন্ত —

শুকনো — বাইরে —

16. পদ পরিবর্তন করো ঃ

জল — বাজার —

গাছ — গাঁ —

17. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

যদি পৃথিবীতে একটাও গাছ না থাকে বা গাছের সংখ্যা অতিমাত্রায় কমে যায় তাহলে কী হতে পারে ? পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

করতে পারো ঃ

ছুটির দিনে তোমরা বন্ধুরা মিলে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুল বা পাড়ায় সুবিধা মতো যায়গায় গাছ লাগাও । সেগুলির যত্ন করা ও রক্ষা করার চেষ্টা করো ।

রাজা - সাজা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পড়ার আগে ভাবো

চোর যদি রাজা সাজে তবে কি দেশ চলবে ? যোগ্য ব্যক্তিরই যোগ্য পদে বসা উচিত, এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কী ? ভেবে দেখো ?

একদিন এক রাজার ঘরে ঢুকেছিল চোর
খুট খাট খাট শব্দ শুনে ভাঙল ঘুমের ঘোর
রাজামশাই চোখ কচলে বলেন, 'কী চাই বল?'
চোর বলল, 'রক্ষা করুন', দুই চোখে তার জল
'কঠিন কোনও শাস্তি প্রভু দেবেন না আমাকে,
বাড়িতে বউ কাচ্চাবাচ্চা পড়বে দুর্বিপাকে ।'
রাজা বলেন, 'মাফ করলাম ইচ্ছেটা কী তোর
কেন রে তুই সিঁদ কেটেছিস, কেন হলি চোর ।
মনের কথা আমাকে তুই সবটা খুলে বল,
কাঁদিস নে আর কাঁদিস নে তুই মোছ দু' চোখের জল ।'

চোরের তখন অভয় পেয়ে সাহস গেছে বেড়ে,
'তাহলে কই শুনুন রাজা', হাসল গলা ছেড়ে ।
'বাচ্চা বয়েস থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল মনে,
রাজা হয়ে বসব আমি সোনার সিংহাসনে ।
রাজা হওয়ার জন্যে আমি যাচ্ছি করে চুরি,
রাজা হলেই এই পৃথিবী হবে স্বর্গপুরী ।'
রাজা বলেন মুচকি হেসে, 'এতই যখন সাধ,
তোকে রাজা করে দেব কাল হলে প্রভাত ।'
চোর বসল সিংহাসনে হয়ে দেশের রাজা
পরল মুকুট এবং আরও ইচ্ছে ছিল যা-যা ।
মন্ত্রী এসে বলেন, 'প্রভু ওদিক পানে খরা,
ত্রাণসামগ্রী পাঠানো চাই দেরি না করে ত্বরা ।'
সেনাপতি বলেন এসে, 'এল শত্রু-সেনা,
সৈন্য চাই, সৈন্য চাই, দেরি তো চলবে না ।'
কোটাল এসে বলেন, 'হুজুর শান্তি নেইকো দেশে,
ধান গম সব লুঠ করেছে লুঠেরারা এসে ।
দেরি না করে শুরু করুন হে প্রভু ধরপাকড় ।'
কৃষিজীবী বলেন এসে, 'বাড়ছে পোকামাকড়,
দেরি না করে ছড়াতে হবে প্রভূত কীটনাশক ।'
'বিদ্রোহী দেয় মাথা চাড়া', বলেন জেলাশাসক ।
চোর-মহারাজ দু'কানে হাত দিয়ে বলে, 'বাঁচাও,
এর চেয়ে দেখি অনেক সুখের জেলের লোহার খাঁচাও ।

সিংহাসনে বসিয়ে প্রভু অনেক দিলেন সাজা,
চাই না আমি চাই না হতে আর যে দেশের রাজা ।'

জেনে রাখো ঃ

দুর্বিপাক — অশুভ পরিণাম

প্রভূত — অনেক

সিঁদ — প্রধানতঃ চুরি করার উদ্দেশ্যে ঘরের দেওয়ালে বা ভিতে কাঁটা সুড়ঙ্গ ।

অভয় — ভয়হীন

কবি পরিচয় ঃ

সাধনা মুখোপাধ্যায় — জন্ম এলাহাবাদে ১৯৩৪ সালে । তিনি আধুনিক বাংলা মহিলা কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য । ছোটদের আনন্দ মেলা পত্রিকার দায়িত্ব ১৫ বছর ধরে পালন করেছেন । কবিতা, ভূগোলের সরস বই, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, ছোটদের জন্য অসংখ্য ছড়া ও গল্প লিখেছেন। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বিখ্যাত । প্রায় তিরিশটি রান্নার বই লিখেছেন । তিনি সাহিত্যিক হিসাবে বহু পুরস্কার পেয়েছেন ।

কাব্য পরিচয় ঃ

রাজার ঘরে চুরি করতে এসে চোর ধরা পড়ে । রাজা চোরের কাছে তার চুরির কারণ জানতে চাইলেন । চোর অভয় পেয়ে রাজা হওয়ার গোপন ইচ্ছা রাজার কাছে ব্যক্ত করল এবং এইজন্যই সে চুরি করে অর্থ সঞ্চয় করছে । রাজা মৃদু হেসে পরদিন তাকে সিংহাসনে বসালেন । মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, কৃষক, জেলাশাসক প্রত্যেকেই দেশের নানা অভাব-অভিযোগ এনে উপস্থিত করল । রাজার পোশাকে দিশেহারা চোর । তার কাছে রাজা সাজা জেলখানার থেকেও কঠিন শাস্তি বলে মনে হোল ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখিত পাঠটির নাম কী ?
2. রাজার ঘরে একদিন কে ঢুকেছিল ?
3. রাজার ঘুম কেমন করে ভাঙলো ?
4. চোর চুরি কেন করতো ?
5. চোরের মনে কোন্ ইচ্ছা ছিল ?
6. চোর কেন রাজা হতে চেয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

7. চোর কেন রাজাকে অনুরোধ করেছিল তাকে কঠিন শাস্তি না দেওয়ার জন্য ?
8. সেনাপতি ও মন্ত্রী রাজার কাছে কোন্ সমস্যা নিয়ে এসেছিল ?
9. কৃষি জীবির সমস্যাই বা কী ছিল ?
10. চোরের মতে রাজ সিংহাসন থেকে অনেক বেশি সুখের জেলের লোহার খাঁচা – কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

11. সিংহাসনে বসার পরে চোর কেন আর দেশের রাজা হতে চাইলো না ? নিজের মতো করে লেখো ।
12. চোর রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলে নানা দিক থেকে যে সব সমস্যা আর সামনে এলো, সে বিষয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

বউ	রাজা
চোর	মহারাজ

2. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

প্রভাত	স্বদেশ
প্রভু	সুখ
হাসি	ইচ্ছা

3. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

দিন, দীন	চুরি, চুড়ি	সুখ, শুক
সোনা, শোনা	মন, মণ	সব, শব

4. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

দুবিপাক	প্রভুত	সিংহাসন
ধড়পাকড়	ত্রান	মুকুট

করতে পারো ঃ

'রাজা-সাজা' কবিতাটি তোমরা স্কুলে বন্ধুরা মিলে অভিনয় করতে পারো । রাজার পোশাক, গয়না, মুকুট, ইত্যাদি রাংতা, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে নিজেরা বানাও । কেউ রাজা, কেউ চোর, মন্ত্রী, সেনাপতি, কৃষক প্রভৃতি কবিতার চরিত্রগুলি সাজো । যে যে চরিত্র সাজবে তারা কথোপকথনগুলি কবিতার ভাষায় লিখে মুখস্ত করে নিয়ে মঞ্চস্থ করো ।

কোন পাখিটা

আশিস সান্যাল

পড়ার আগে ভাবো

তোমরা কি কখনও তোমাদের আশে-পাশে নানা ধরণের চেনা-অচেনা পাখিদের রং, রূপ, সুরের খেলা লক্ষ্য করেছ ?

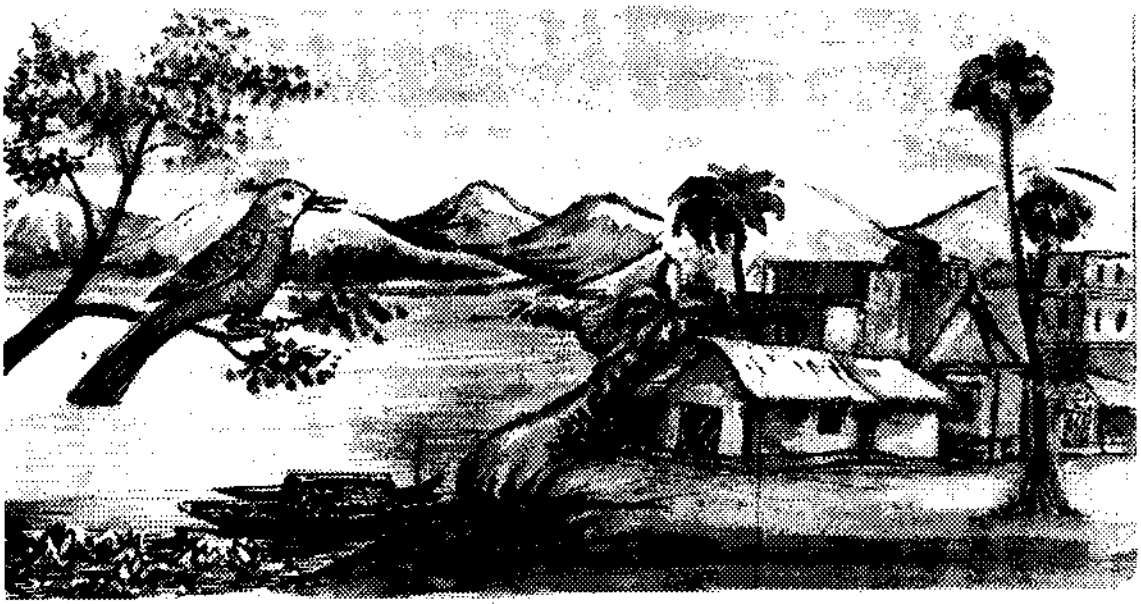

কোন পাখিটা পুচ্ছ নাচায়,

কোন পাখিটা ডাকে,

কোন পাখিটা সজনে গাছে

মুখ লুকিয়ে থাকে ?
কোন পাখিটা ভোরের হাওয়ায়
সবুজ ধোওয়া বনে,
নতুন পাতার আবছায়াতে
দোলে আপন মনে ?
কোন পাখিটা নীলের বুকে
দূর আকাশের গায়,
নীলের স্রোতে পাখনা মেলে
অবাক উড়ে যায় ?
ইচ্ছে করে সকাল দুপুর
বসে সবুজ ঘাসে,
দেখি সেসব পাখির খেলা
নদীর আশেপাশে ।
ক্লাসের পড়া পড়ে যখন
ভাবছ সবাই ধন্য,
আমি না হয় পাখির দেশে
পড়ব কিছু অন্য ।

কবি পরিচয় ঃ

আশিস সান্যাল ৭ জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা বর্তমান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপনা করাই তাঁর জীবিকা । চারুচন্দ্র কলেজ পত্রিকায় ১৯৫৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'কোনদিন দেখা হলে' প্রকাশিত হয় । প্রথম জীবনে নজরুলের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'প্রথম আলো', 'মৃত্যুদিন জন্মদিন', 'আজ বসন্ত', 'স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ।

কাব্য পরিচয় ঃ

নাম না জানা ছোট ছোট পাখিগুলি, কোনটি হয়ত সবুজ পাতার আড়ালে থাকে, কোনটি কেবল পুচ্ছ নাচায়, কোনটি সুদুর নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে যায় । ছোট্ট পড়ুয়ার চার দেয়ালের মাঝে বাঁধা - ধরা পড়াশুনায় মন বসে না । তার মন গ্রামের পথে, সবুজ গাছের আড়ালে, নদীর ধারে পাখির খোঁজে ঘুরে বেড়ায় । সারাদিন সকল বন্ধন মুক্ত এই নাম না জানা পাখিদের জগতে তাদের খেলার মাঝে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **কোন পাখিটা ..... নাচায়,**
   কোন পাখিটা ডাকে ।

(ডানা, পুচ্ছ, পেখম)

2. **কোন পাখিটা ..... গাছে**
   মুখ লুকিয়ে থাকে ?

(আম, জাম, সজনে)

3. **ইচ্ছে করে সকাল দুপুর**
   বসে ..... ।

(নদীর ধারে, পথের পাশে, সবুজ ঘাসে)

4. **আমি না হয় ..... দেশে**
   পড়ব অন্য কিছু ।

(পাখির, নদীর, পাতার)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. 'কোন পাখিটা' কবিতাটি কার লেখা ?

6. আকাশের গায়ে কে উড়ে বেড়ায় ?

7. ক্লাসের বাঁধা - ধরা পড়ায় কার মন বসে না ?

8. ক্লাসের ছোট পড়ুয়াটির কোথায় হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. নাম না জানা পাখিদের যে বর্ণনা 'কোন পাখিটা' কবিতাটিতে আছে সেটি নিজের ভাষায় লেখো ।

10. 'কোন পাখিটা' কবিতাটিতে ছোট্ট পড়ুয়ার কী ইচ্ছে করে ? কবিতাটি অবলম্বনে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ খেলো ঃ

নতুন	আকাশ	আপন
দূর	সকাল	ইচ্ছা

2. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

মুক মূক	আসা, আশা
আপন, আপণ	অন্ন, অন্য

3. বাক্য রচনা করো ঃ

পাখি	সবুজ	ধন্য
খেলা	দেশ	ভোর

4. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

তোমাদের দেখা আশে-পাশে উড়ে বেড়ানো পাখিদের রং, তাদের নাম, তারা সারাদিন কী করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে লেখো ।